সাহিত্য কণিকা

দাখিল

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে দাখিল অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

সাহিত্য কণিকা

দাখিল

অষ্টম শ্রেণি

সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক

অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী

অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান

অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক

অধ্যাপক শ্যামলী আকবর

অধ্যাপক ড. সরকার আবদুল মান্নান

অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর

ড. শোয়াইব জিবরান

শামীম জাহান আহসান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১১
পরিমার্জিত সংস্করণ : আগস্ট, ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৮

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক । পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প-২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

শোনা, বলা, পড়া ও লেখা'র দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলা **সাহিত্য কণিকা** শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটির অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জীবন ও জগতের বিচিত্র বিষয়ে কৌতূহলী হবে, পাঠাভ্যাসে আগ্রহ দেখাবে, পঠিত বিষয়ের মর্ম অনুধাবন এবং চিন্তন দক্ষতা ও রসগ্রহণের যোগ্যতা অর্জনে সক্ষমতা অর্জন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তক মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রবর্তন করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
	গদ্য		
১.	অতিথির স্মৃতি	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	০১
২.	ভাব ও কাজ	কাজী নজরুল ইসলাম	০৬
৩.	পড়ে পাওয়া	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২
৪.	তৈলচিত্রের ভূত	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	২০
৫.	এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম	শেখ মুজিবুর রহমান	২৮
৬.	আমাদের লোকশিল্প	কামরুল হাসান	৩৪
৭.	সুখী মানুষ	মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ	৪১
৮.	শিল্পকলার নানা দিক	মুস্তাফা মনোয়ার	৪৮
৯.	মদিনার পথে	মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী	৫৩
১০.	বাংলা নববর্ষ	শামসুজ্জামান খান	৬০
১১.	বাংলা ভাষার জন্মকথা	হুমায়ুন আজাদ	৬৬
	কবিতা		
১	বঙ্গভূমির প্রতি	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৭১
২.	দুই বিঘা জমি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭৫
৩.	পাছে লোকে কিছু বলে	কামিনী রায়	৮২
৪.	প্রার্থনা	কায়কোবাদ	৮৬
৫.	বাবুরের মহত্ত্ব	কালিদাস রায়	৮৯
৬.	নারী	কাজী নজরুল ইসলাম	৯৫
৭.	আবার আসিব ফিরে	জীবনানন্দ দাশ	৯৯
৮.	রুপাই	জসীমউদ্‌দীন	১০৩
৯.	নদীর স্বপ্ন	বুদ্ধদেব বসু	১০৭
১০.	জাগো তবে অরণ্য কন্যারা	সুফিয়া কামাল	১১১
১১.	প্রার্থী	সুকান্ত ভট্টাচার্য	১১৫
১২.	মাগো ওরা বলে	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	১১৯
১৩.	একুশের গান	আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী	১২৩
	পরিশিষ্ট		
১.	কর্ম-অনুশীলন		১২৭

অতিথির স্মৃতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিকিৎসকের আদেশে দেওঘরে এসেছিলাম বায়ু পরিবর্তনের জন্যে। বায়ু পরিবর্তনে সাধারণত যা হয়, সেও লোকে জানে, আবার আসেও। আমিও এসেছি। প্রাচীর ঘেরা বাগানের মধ্যে একটা বড় বাড়িতে থাকি। রাত্রি তিনটে থেকে কাছে কোথাও একজন গলাভাঙা একঘেয়ে সুরে ভজন শুরু করে, ঘুম ভেঙে যায়, দোর খুলে বারান্দায় এসে বসি। ধীরে ধীরে রাত্রি শেষ হয়ে আসে— পাখিদের আনাগোনা শুরু হয়। দেখতাম ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভোরে ওঠে দোয়েল। অন্ধকার শেষ না হতেই তাদের গান আরম্ভ হয়, তারপরে একটি দুটি করে আসতে থাকে বুলবুলি, শ্যামা, শালিক, টুনটুনি— পাশের বাড়ির আমগাছে, এ বাড়ির বকুল-কুঞ্জে, পথের ধারের অশ্বত্থগাছের মাথায়— সকলকে চোখে দেখতে পেতাম না, কিন্তু প্রতিদিন ডাক শোনার অভ্যাসে মনে হতো যেন ওদের প্রত্যেককেই চিনি। হলদে রঙের একজোড়া বেনে-বৌ পাখি একটু দেরি করে আসত। প্রাচীরের ধারের ইউক্যালিপটাস গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালটায় বসে তারা প্রত্যহ হাজিরা হেঁকে যেত। হঠাৎ কী জানি কেন দিন-দুই এলো না দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, কেউ ধরলে না তো? এদেশে ব্যাধের অভাব নেই, পাখি চালান দেওয়াই তাদের ব্যবসা— কিন্তু তিন দিনের দিন আবার দুটিকে ফিরে আসতে দেখে মনে হলো যেন সত্যিকার একটা ভাবনা ঘুচে গেল।

এমনি করে সকাল কাটে। বিকালে গেটের বাইরে পথের ধারে এসে বসি। নিজের সামর্থ্য নেই বেড়াবার, যাদের আছে তাদের প্রতি চেয়ে চেয়ে দেখি। দেখতাম মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে পীড়িতদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই ঢের বেশি। প্রথমেই যেত পা ফুলো-ফুলো অল্পবয়সী একদল মেয়ে। বুঝতাম এরা বেরিবেরির আসামি। ফোলা পায়ের লজ্জা ঢাকতে বেচারাদের কত না যত্ন। মোজা পরার দিন নয়, গরম পড়েছে, তবু দেখি কারও পায়ে আঁট করে মোজা পরা। কেউ বা দেখলাম মাটি পর্যন্ত লুটিয়ে কাপড় পরেছে—সেটা পথ চলার বিঘ্ন, তবু, কৌতূহলী লোকচক্ষু থেকে তারা বিকৃতিটা আড়াল রাখতে চায়। আর সবচেয়ে দুঃখ হতো আমার একটি দরিদ্র ঘরের মেয়েকে দেখে। সে একলা যেত। সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন নেই, শুধু তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। বয়স বোধ করি চব্বিশ-পঁচিশ, কিন্তু দেহ যেমন শীর্ণ, মুখ তেমনি পাড়ুর—কোথাও যেন এতটুকু রক্ত নেই। শক্তি নেই নিজের দেহটাকে টানবার, তবু সবচেয়ে ছোট ছেলেটি তার কোলে। সে তো আর হাঁটতে পারে না— অথচ, ফিরে আসবারও ঠাঁই নেই ? কী ক্লান্তই না মেয়েটির চোখের চাহনি।

সেদিন সন্ধ্যার তখনও দেরি আছে, দেখি জনকয়েক বৃদ্ধ ব্যক্তি ক্ষুধা হরণের কর্তব্যটা সমাধা করে যথাশক্তি দ্রুতপদেই বাসায় ফিরছেন। সম্ভবত এরা বাতব্যাধিগ্রস্ত , সন্ধ্যার পূর্বেই এদের ঘরে প্রবেশ করা প্রয়োজন। তাঁদের চলন দেখে ভরসা হলো, ভাবলাম যাই, আমিও একটু ঘুরে আসিগে। সেদিন পথে পথে অনেক বেড়ালাম। অন্ধকার হয়ে এলো, ভেবেছিলাম আমি একাকী, হঠাৎ পেছনে চেয়ে দেখি একটি কুকুর আমার পেছনে চলেছে। বললাম, কী রে, যাবি আমার সঙ্গে? অন্ধকার পথটায় বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারবি ? সে দূরে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল। বুঝলাম সে রাজি আছে। বললাম, তবে আয় আমার সঙ্গে। পথের ধারের একটা আলোতে দেখতে পেলাম কুকুরটার

বয়স হয়েছে; কিন্তু যৌবনে একদিন শক্তিসামর্থ্য ছিল। তাকে অনেক কিছু প্রশ্ন করতে করতে বাড়ির সম্মুখে এসে পৌঁছলাম। গেট খুলে দিয়ে ডাকলাম, ভেতরে আয়। আজ তুই আমার অতিথি। সে বাইরে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল, কিছুতে ভিতরে ঢোকার ভরসা পেল না। আলো নিয়ে চাকর এসে উপস্থিত হলো, গেট বন্ধ করে দিতে চাইলে, বললাম, না, খোলাই থাক। যদি আসে, ওকে খেতে দিস। ঘণ্টাখানেক পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম সে আসে নি— কোথায় চলে গেছে।

পরদিন সকালে বাইরে এসেই দেখি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার সেই কালকের অতিথি। বললাম, কাল তোকে খেতে নেমন্তন্ন করলাম, এলিনে কেন?

জবাবে সে মুখপানে চেয়ে তেমনি ল্যাজ নাড়তে লাগল। বললাম, আজ তুই খেয়ে যাবি,— না খেয়ে যাসনে বুঝলি? প্রত্যুত্তরে সে শুধু ঘন ঘন ল্যাজ নাড়লে— অর্থ বোধ হয় এই যে, সত্যি বলছো তো?

রাত্রে চাকর এসে জানালে সেই কুকুরটা এসে আজ বাইরের বারান্দার নিচে উঠানে বসে আছে। বামুনঠাকুরকে ডেকে বলে দিলাম, ও আমার অতিথি, ওকে পেট ভরে খেতে দিও।

পরের দিন খবর পেলাম অতিথি যায় নি। আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে সে আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। বললাম, তা হোক, ওকে তোমরা খেতে দিও।

আমি জানতাম, প্রত্যহ খাবার তো অনেক ফেলা যায়, এতে কারও আপত্তি হবে না। কিন্তু আপত্তি ছিল এবং অত্যন্ত গুরুতর আপত্তি। আমাদের বাড়তি খাবারের যে প্রবল অংশীদার ছিল এ বাগানের মালির মালিনী— এ আমি জানতাম না। তার বয়স কম, দেখতে ভালো এবং খাওয়া সম্বন্ধে নির্বিকারচিত্ত। চাকরদের দরদ তার পরেই বেশি। অতএব, আমার অতিথি করে উপবাস। বিকালে পথের ধারে গিয়ে বসি, দেখি অতিথি আগে থেকেই বসে আছে ধুলোয়। বেড়াতে বার হলে সে হয় পথের সঙ্গী; জিজ্ঞাসা করি, হ্যাঁ অতিথি, আজ মাংস রান্নাটা কেমন হয়েছিল রে? হাড়গুলো চিবোতে লাগল কেমন? সে জবাব দেয় ল্যাজ নেড়ে, মনে করি মাংসটা তা হলে ওর ভালোই লেগেছে। জানিনে যে মালির বউ তারে মেরেধরে বার করে দিয়েছে— বাগানের মধ্যে ঢুকতে দেয় না, তাই ও সুমুখের পথের ধারে বসে কাটায়। আমার চাকরদেরও তাতে সায় ছিল।

হঠাৎ শরীরটা খারাপ হলো, দিন-দুই নিচে নামতে পারলাম না। দুপুরবেলা উপরের ঘরে বিছানায় শুয়ে, খবরের কাগজটা যেইমাত্র পড়া হয়ে গেছে, জানালার মধ্য দিয়ে বাইরের রৌদ্রতপ্ত নীল আকাশের পানে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিলাম। সহসা খোলা দোর দিয়ে সিঁড়ির উপর ছায়া পড়ল কুকুরের। মুখ বাড়িয়ে দেখি অতিথি দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে। দুপুরবেলা চাকরেরা সব ঘুমিয়েছে, ঘর তাদের বন্ধ, এই সুযোগে লুকিয়ে সে একেবারে আমার ঘরের সামনে এসে হাজির। ভাবলাম, দুদিন দেখতে পায় নি, তাই বুঝি আমাকে ও দেখতে এসেছে। ডাকলাম, আয় অতিথি, ঘরে আয়। সে এলো না, সেখানে দাঁড়িয়েই ল্যাজ নাড়তে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম— খাওয়া হয়েছে তো রে? কী খেলি আজ?

হঠাৎ মনে হলো ওর চোখ দুটো যেন ভিজেভিজে, যেন গোপনে আমার কাছে কী একটা নালিশ ও জানাতে চায়। চাকরদের হাঁক দিলাম, ওদের দোর খোলার শব্দেই অতিথি ছুটে পালাল।

জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁ রে, কুকুরটাকে আজ খেতে দিয়েছিস?

আজ্ঞে না। মালি-বৌ ওরে তাড়িয়ে দিয়েছে যে।

আজ তো অনেক খাবার বেঁচেছে, সে সব হলো কী?

মালি-বৌ চেঁচেপুঁচে নিয়ে গেছে।

আমার অতিথিকে ডেকে আনা হলো, আবার সে বারান্দার নিচে উঠানের ধুলোয় পরম নিশ্চিন্তে স্থান করে নিল। মালি-বৌয়ের ভয়টা তার গেছে। বেলা যায়, বিকাল হলে উপরের বারান্দা থেকে দেখি অতিথি এই দিকে চেয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে। বেড়াতে যাবার সময় হলো যে।

শরীর সারলো না, দেওঘর থেকে বিদায় নেবার দিন এসে পড়ল। তবু দিন-দুই দেরি করলাম নানা ছলে। আজ সকাল থেকে জিনিস বাঁধাবাঁধি শুরু হলো, দুপুরে ট্রেন। গেটের বাইরে সার সার গাড়ি এসে দাঁড়াল, মালপত্র বোঝাই দেওয়া চলল। অতিথি মহাব্যস্ত, কুলিদের সঙ্গে ক্রমাগত ছুটোছুটি করে খবরদারি করতে লাগল, কোথাও যেন কিছু

২০১৬

খোয়া না যায়। তার উৎসাহই সবচেয়ে বেশি।

একে একে গাড়িগুলো ছেড়ে দিলে, আমার গাড়িটাও চলতে শুরু করল। স্টেশন দূরে নয়, সেখানে পৌঁছে নামতে গিয়ে দেখি অতিথি দাঁড়িয়ে। কিরে, এখানেও এসেছিস? সে ল্যাজ নেড়ে তার জবাব দিলে, কি জানি মানে তার কী!

টিকিট কেনা হলো, মালপত্র তোলা হলো, ট্রেন ছাড়তে আর এক মিনিট দেরি। সঙ্গে যারা তুলে দিতে এসেছিল তারা বকশিশ পেল সবাই, পেল না কেবল অতিথি। গরম বাতাসে ধুলো উড়িয়ে সামনেটা আচ্ছন্ন করেছে, যাবার আগে তারই মধ্য দিয়ে ঝাপসা দেখতে পেলাম— স্টেশনের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে অতিথি। ট্রেন ছেড়ে দিলে, বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না। হয়ত, ওর চেয়ে তুচ্ছ জীব শহরে আর নেই! কেবলই মনে হতে লাগল, অতিথি আজ ফিরে গিয়ে দেখবে বাড়ির লোহার গেট বন্ধ, ঢোকবার জো নেই! পথে দাঁড়িয়ে দিন-দুই তার কাটবে, হয়ত নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের কোন ফাঁকে লুকিয়ে উপরে উঠে খুঁজে দেখবে আমার ঘরটা।

শব্দার্থ ও টীকা

ভজন	—	ঈশ্বর বা দেবদেবীর স্তুতি বা মহিমাকীর্তন। প্রার্থনামূলক গান।
দোর	—	দুয়ার বা দরজা। বাড়ির ফটক।
কুঞ্জ	—	লতাপাতায় আচ্ছাদিত বৃত্তাকার স্থান, উপবন।
বেরিবেরি	—	শোথ জাতীয় রোগ, যাতে হাত-পা ফুলে যায়।
আসামি	—	এ শব্দটি দিয়ে সাধারণত আদালতে কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে রোগাক্রান্তদের বোঝানো হয়েছে।
পাণ্ডুর	—	ফ্যাকাশে।
মালি	—	মালা রচনাকারী, মালাকর। বেতনের বিনিময়ে বাগানের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি।
মালিনী	—	মালির স্ত্রী।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ গল্প পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা পরিহার করে সহানুভূতিশীল হবে।

পাঠ-পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেওঘরের স্মৃতি' গল্পটির নাম পাল্টে এবং ঈষৎ পরিমার্জনা করে এখানে 'অতিথির স্মৃতি' হিসেবে সংকলন করা হয়েছে। একটি প্রাণীর সঙ্গে একজন অসুস্থ মানুষের কয়েকদিনের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা মমত্বের সম্পর্কই এ গল্পের বিষয়। লেখক দেখিয়েছেন, মানুষে-মানুষে যেমন স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক অন্য জীবের সঙ্গেও মানুষের তেমন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেই সম্পর্ক নানা প্রতিকূল কারণে স্থায়ীরূপ পেতে বাধাগ্রস্ত হয়। আবার এই সম্পর্কের সূত্র ধরে একটি মানুষ ওই জীবের প্রতি যখন মমতায় সিক্ত হয় তখন অন্য মানুষের আচরণ নির্মম হয়ে উঠতে পারে। এ গল্পে সম্পর্কের এই বিচিত্র রূপই প্রকাশ করা হয়েছে।

লেখক-পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কৈশোর ও যৌবনের অধিকাংশ সময় ভাগলপুরের মাতুলালয়ে অতিবাহিত হয়। দারিদ্র্যের কারণে কলেজ শিক্ষা অসমাপ্ত থাকে। জীবিকার সন্ধানে রেঙ্গুন গমন ও সেখানে অবস্থানকালে (১৯০৩–১৯১৬) সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' উপন্যাস প্রকাশিত হলে তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এরপর একের পর এক গল্প–উপন্যাস লিখে তিনি এমনভাবে পাঠকহৃদয় জয় করেন যে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখকে পরিণত হন। সাধারণ বাঙালি পাঠকের আবেগকে তিনি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে : 'পল্লীসমাজ', 'দেবদাস', 'শ্রীকান্ত' (চার পর্ব), 'গৃহদাহ', 'দেনাপাওনা', 'পথের দাবী', 'শেষ প্রশ্ন প্রভৃতি'। সাহিত্য প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যের এই কালজয়ী কথাশিল্পীর জীবনাবসান ঘটে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায়।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার অভিজ্ঞতা থেকে একটি ভ্রমণকাহিনীর বিবরণ লেখ (একক কাজ)।

খ. তোমার প্রিয় কোনো পশু বা পাখির কোন কোন আচরণ তোমার কাছে মানুষের আচরণের মতো মনে হয়, তার একটি বর্ণনা দাও (একক কাজ)

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাত ব্যাধিগ্রস্ত রোগীরা কখন ঘরে প্রবেশ করে ?

ক. সন্ধ্যার পূর্বে খ. সন্ধ্যার পরে

গ. বিকেল বেলা ঘ. গোধূলি বেলা

২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি পেয়েছেন ?

ক. ঢাকা খ. কলকাতা

গ. অক্সফোর্ড ঘ. কেমব্রিজ

৩. আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন বলতে বোঝায় ?

i. কোনো তিথি না মেনে কারো আগমনকে

ii. মাত্রাতিরিক্ত সময় আতিথেয়তা গ্রহণ করাকে

iii. অবাঞ্ছিতভাবে কোনো অতিথির অধিক সময় অবস্থানকে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাবা-মার আদরের দুই ছেলে আশিক ও আকাশ এবার ক্লাস টুতে পড়ে। ওদের বাবা একদিন ছোট্ট খাঁচায় একটি ময়না পাখি উপহার দেয়। সেই থেকে সারাক্ষণ দুই ভাই প্রতিযোগিতা করে পাখিটিকে খাবার ও পানি দেওয়া, কথা বলা আর কথা শেখানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু একদিন সকালে দেখে, বিড়াল এসে রাতে পাখিটাকে মেরে ফেলেছে। সেই থেকে যে তাদের অঝোর ধারায় কান্না, কেউ আর থামাতেই পারে না। আজও সেই ময়নার কথা মনে হলে ওরা কেঁদে ওঠে।

৪। উদ্দীপকে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে তা হলো—

i. পশু-পাখির সাথে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক

ii. পশু-পাখির সাথে মানুষের স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক

iii. ভালোবাসায় সিক্ত পশু–পাখির বিচ্ছেদ বেদনায় কাতরতা

২০১৬

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৫. উক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবটি নিচের কোন চরণে প্রকাশ পেয়েছে ?

ক. বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না

খ. আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে সে আরামে নিশ্চিত হয়ে বসে আছে

গ. অতএব আমার অতিথি উপবাস করে

ঘ. তা হোক, ওকে তোমরা খেতে দিও

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মহেশ। দরিদ্র বর্গাচাষি গফুরের অতি আদরের একমাত্র ষাঁড়। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে ওকে ঠিকমত খড়-বিচুলি খেতে দিতে পারে না। জমিদারের কাছে সামান্য খড় ধার চেয়েও পায় না। নিজে না খেয়ে থাকলেও গফুরের দুঃখ নেই। কিন্তু মহেশকে খাবার দিতে না পেরে তার বুক ফেটে যায়। সে মহেশের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে— মহেশ, তুই আমার ছেলে। তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস। তোকে আমি পেট পুরে খেতে দিতে পারি নে, কিন্তু তুই তো জানিস আমি তোকে কত ভালোবাসি। মহেশ প্রত্যুত্তরে গলা বাড়িয়ে আরামে চোখ বুজে থাকে।

ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেওঘরে যাওয়ার কারণ কী ?

খ. অতিথি কিছুতে ভিতরে ঢোকার ভরসা পেল না কেন ? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে মহেশের প্রতি গফুরের আচরণে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের গফুরের সাথে লেখকের চেতনাগত মিল থাকলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন–'অতিথির স্মৃতি' গল্পের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

২. লালমনিরহাটের যুবায়ের প্রায় ১০ বছর ধরে তার পোষাহাতি, কালাপাহাড়কে দিয়ে লাকড়ি টানা, চাষ করা, সার্কাস দেখানো ইত্যাদি কাজ করে আসছিল। কিন্তু বর্তমানে দারিদ্র্যের কারণে হাতির খোরাক জোগাড় করতে না পেরে একদিন সে কালাপাহাড়কে বিক্রি করে দিল। ক্রেতা কালাপাহাড়কে নিতে এসে ওর পায়ে বাঁধা রশি ধরে হাজার টানাটানি করে একচুলও নাড়াতে পারল না। কালাপাহাড়ের দুচোখ বেয়ে শুধু টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। পরদিন খদ্দের আরও বেশি লোকজন সাথে করে এসে কালাপাহাড়কে নিয়ে যাবে বলে চলে যায়। কিন্তু ভোরবেলা যুবায়ের দেখে— কালাপাহাড় মরে পড়ে আছে। হাউমাউ করে সে চিৎকার করে আর বলে—'ওরে আমার কালাপাহাড়, অভিমান করে তুই চলে গেলি!'

ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন পদক লাভ করেন ?

খ. লেখক দেওঘর থেকে বিদায় নিতে নানা অজুহাতে দিন দুই দেরি করলেন কেন ? ব্যাখ্যা কর।

গ. কালাপাহাড়ের আচরণ 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের অতিথির আচরণ কীভাবে ভিন্ন– বর্ণনা কর।

ঘ. 'উদ্দীপকের যুবায়ের এর অনুভূতি আর 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের অনুভূতি একই ধারায় উৎসারিত'—মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

ভাব ও কাজ

কাজী নজরুল ইসলাম

ভাবে আর কাজে সম্বন্ধটা খুব নিকট বোধ হইলেও আদতে এ-জিনিস দুইটায় কিন্তু আসমান-জমিন তফাৎ। ভাব জিনিসটা হইতেছে পুষ্পবিহীন সৌরভের মতো, একটা অবাস্তব উচ্ছ্বাস মাত্র। তাই বলিয়া কাজ মানে যে সৌরভবিহীন পুষ্প, ইহা যেন কেহ মনে করিয়া না বসেন। কাজ জিনিসটাই ভাবকে রূপ দেয়, ইহা সম্পূর্ণভাবে বস্তুজগতের।

তাই বলিয়া ভাবকে যে আমরা মন্দ বলিতেছি বা নিন্দা করিতেছি, তাহা নহে; ভাব জিনিসটা খুবই ভালো। মানুষকে কব্জায় আনিবার জন্য তাহার সর্বাপেক্ষা কোমল জায়গায় ছোঁওয়া দিয়া তাহাকে মাতাইয়া না তুলিতে পারিলে তাহার দ্বারা কোনো কাজ করানো যায় না, বিশেষ করিয়া আমাদের এই ভাব-পাগলা দেশে। কিন্তু শুধু 'ভাব' লইয়াই থাকিব, লোককে শুধু কথায় মাতাইয়া মশগুল করিয়াই রাখিব, এও একটা মস্ত বদ-খেয়াল। এই 'ভাব'কে কার্যের দাসরূপে নিয়োগ করিতে না পারিলে ভাবের কোনো সার্থকতাই থাকে না। তাহা ছাড়া ভাব দিয়া লোককে মাতাইয়া তুলিয়া যদি সেই সময় গরমাগরম কার্যসিদ্ধি করাইয়া লওয়া না হয়, তাহা হইলে পরে সে ভাবাবেশ কর্পূরের মতো উড়িয়া যায়। অবশ্য, এখানে কার্যসিদ্ধি মানে কার্যসিদ্ধি নয়। যিনি ভাবের বাঁশি বাজাইয়া জনসাধারণকে নাচাইবেন, তাঁহাকে নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষি হইতে হইবে। তিনি লোকদিগের সূক্ষ্ম অনুভূতি বা ভাবকে জাগাইয়া তুলিবেন মানুষের কল্যাণের জন্য, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। তাঁহাকে একটা খুব মহত্তর উদ্দেশ্য ও কল্যাণ কামনা লইয়া ভাবের বন্যা বহাইতে হইবে, নতুবা বানভাসির পর পলিপড়ার মতো সাধারণের সমস্ত উৎসাহ ও প্রাণ একেবারে কাদাঢাকা পড়িয়া যাইবে। এই জন্য কেহ কেহ বলেন যে, লোকের কোমল অনুভূতিতে ঘা দেওয়া পাপ। কেননা অনেক সময় অনুপযুক্ততা প্রযুক্ত ইহা হইতে সুফল না ফলিয়া কুফলই ফলে। আগে হইতে সমস্ত কার্যের বন্দোবস্ত করিয়া বা কার্যক্ষেত্র তৈয়ার রাখিয়া তবে লোকদিগকে সোনার কাঠির ছোঁওয়া দিয়া জাগাইয়া তুলিতে হইবে। নতুবা তাহারা যখন জাগিয়া দেখিবে যে, তাহারা অনর্থক জাগিয়াছে, কোনো কার্য করিবার নাই, তখন মহা বিরক্ত হইয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িবে এবং তখন আর জাগাইলেও জাগিবে না। কেননা, তখন যে তাহারা জাগিয়া ঘুমাইবে এবং জাগিয়া ঘুমাইলে তাহাকে কেহই তুলিতে পারে না। তাহা অপেক্ষা বরং কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভালো, সে-ঘুম ঢোল কাঁসি বাজাইয়া ভাঙানো বিচিত্র নয়।

এ-কথাটা একটা মস্ত সত্যি, তাহা এতদিনে আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি। এই যে সেদিন একটা হুজুগে মাতিয়া হুড়হুড় করিয়া হাজার কতক স্কুল-কলেজের ছাত্রদল বাহির হইয়া আসিল, কই তাহারা তো তাহাদের এই সৎ সঙ্কল্প, এই মহৎ ত্যাগকে স্থায়ীরূপে বরণ করিয়া লইতে পারিল না। কেন এমন হইল? একটা সাময়িক উত্তেজনার মুখে এই ত্যাগের অভিনয় করিতে গিয়া 'স্পিরিট'কে কী বিশ্রী ভাবেই না মুখ ভ্যাঙচানো হইল! যাহারা শুধু ভাবের চোটে না বুঝিয়া না

শুনিয়া শুধু একটু নামের জন্য বা বদনামের ভয়ে এমন করিয়া তাহাদের 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তির পবিত্রতা নষ্ট করিল, তাহারা কি দরকার পড়িলে আবার কাল এমনি করিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিবে? আজ যাহারা মুখে চাদর জড়াইয়া কল্যকার ত্যক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার মুখটি চুন করিয়া ঢুকিল, কাল দেশের সত্যিকার ডাক আসিলে তাহারা কি আর তাহাতে সাড়া দিতে পারিবে? হঠকারিতা করিয়া একবার যে ভোগটা ভুগিল বা ভ্রম করিল, তাহারই অনুশোচনাটা তাহারা কিছুতেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না—বাহিরে যতই কেন লা-পরওয়া ভাব দেখাক না। এখন সত্যিকার ডাক শুনিয়া প্রাণ চাহিলেও সে লজ্জায় তাহাতে আসিয়া যোগদান করিতে পারিবে না। এই রূপে আমরা আমাদের দেশের প্রাণশক্তি এই তরুণদের 'স্পিরিট'টাকে কুব্যবহারে আনিয়া মঙ্গলের নামে দেশের মহা শত্রুতা সাধনই করিতেছি নাকি? রাগিবার কথা নয়, এখন ইহা রীতিমতো বিবেচনা-সাপেক্ষ। আমাদের এই আশা-ভরসাস্থল যুবকগণ এত দুর্বল হইল কীরূপে বা এমন কাপুরুষের মতো ব্যবহারই বা করিল কেন? সে কি আমাদেরই দোষে নয়? সাপ লইয়া খেলা করিতে গেলে তাহাকে দস্তুরমত সাপুড়ে হওয়া চাই, শুধু একটু বাঁশি বাজাইতে পারিলেই চলিবে না। আজ যদি সত্যিকার কর্মী থাকিত দেশে, তাহা হইলে এমন সুবর্ণ সুযোগ মাঝ-মাঠে মারা যাইত না। ত্যাগী অনেক আছেন দেশে কিন্তু কর্মীর অভাবে বা তথাকথিত কর্মী নামে অভিহিত লোকদের সত্য সাধনার অভাবে তাঁহারা কোনো ভালো কাজে আর কোনো অর্থ দিতে চাহেন না, বা অন্য কোনোরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতেও রাজি নন। কী করিয়া হইবেন? তাঁহারা তাঁহাদের চোখের সামনে দেখিতেছেন যে, কতো লোকের কতো মাথার ঘাম পায়ে ফেলার ধন দেশের নামে, কল্যাণের নামে আদায় করিয়া বাজে লোকে নিজেদের উদর পূর্ণ করিতেছে। যাঁহারা সত্যিকার দেশকর্মী—সে বেচারারা সত্যি কথা স্পষ্টভাবে বলিতে গিয়া এই সব কর্মীর কারচুপিতে পুয়ালচাপা পড়িয়া গিয়াছে। বেচারারা এখন ভালো বলিতে গেলেও এই মুখোশ-পরা ত্যাগী মহাপুরুষগণ হট্টগোল বাধাইয়া লোককে সম্পূর্ণ উল্টা বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে একদম খেলো, ঝুটা ইত্যাদি প্রমাণ করিয়া দেন। সহজ জনসাধারণের সরল মন এ-সব না ধরিতে পারার দরুন তাহাদের মন অতি অল্পেই ঐ সত্যিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে বিষাইয়া উঠে। 'দশচক্রে ভগবান ভূত' কথাটা মস্ত সত্যি কথা।

তাহা হইলে এখন উপায় কী? এক সহজ উপায় এই যে, এখন হইতে জনসাধারণের বা শিক্ষিত কেন্দ্রের উচিত, ভাবের আবেগে অতিমাত্রায় বিহ্বল হইয়া কাণ্ডাকাণ্ড ভালোমন্দ জ্ঞান হারাইয়া না ফেলা। আমরা বলিব, ভাবের সুরা পান করো ভাই, কিন্তু জ্ঞান হারাইও না। তাহা হইলে তোমার পতন, তোমার দেশের পতন, তোমার ধর্মের পতন, মনুষ্যত্বের পতন। ভাবের দাস হইও না, ভাবকে তোমার দাস করিয়া লও। কর্মে শক্তি আনিবার জন্য ভাব-সাধনা কর। 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তিকে জাগাইয়া তোল, কিন্তু তাই বলিয়া কর্মকে হারাইও না। অন্ধের মত কিছু না বুঝিয়া না শুনিয়া ভেড়ার মত পেছন ধরিয়া চলিও না। নিজের বুদ্ধি, নিজের কর্মশক্তিকে জাগাইয়া তোল। তোমার এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যই দেশকে উন্নতির দিকে, মুক্তির দিকে আগাইয়া লইয়া যাইবে। এ-সব জিনিস ভাব-আবিষ্ট হইয়া চক্ষু বুজিয়া হয় না। কোমর বাঁধিয়া কার্যে নামিয়া পড়িতে হইবে এবং নামিবার পূর্বে ভালো করিয়া বুঝিয়া-সুঝিয়া দেখিয়া লইতে হইবে, ইহার ফল কী। শুধু উদ্‌মো ষাঁড়ের মতো দেওয়ালের সঙ্গে গা ঘেঁষড়াইয়া নিজের চামড়া তুলিয়া ফেলা হয় মাত্র। দেওয়াল প্রভু কিন্তু দিব্যি দাঁড়াইয়া থাকেন। তোমার বন্ধন ওই সামনের দেওয়ালকে ভাঙিতে হইলে একেবারে তাহার ভিত্তিমূলে শাবল মারিতে হইবে।

আবার বলিতেছি, আর ভাবের ঘরে চুরি করিও না। আগে ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখ। কার্যের সম্ভাবনা-অসম্ভাবনার কথা অগ্রে বিবেচনা করিয়া পরে কার্যে নামিলে তোমার উৎসাহ অনর্থক নষ্ট হইবে না। মনে রাখিও তোমার 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তিকে অন্যের প্ররোচনায় নষ্ট করিতে তোমার কোনো অধিকার নাই। তাহা পাপ— মহাপাপ!

[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

আসমান — আকাশ।

জমিন — মাটি, ভূ-পৃষ্ঠ।

কব্জায় — আয়ত্তে, অধিকারে।

মশগুল — মগ্ন, বিভোর।

বদখেয়াল — খারাপ চিন্তা, খারাপ আচরণ।

দাদ — প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা।

কর্পূর — বৃক্ষরস থেকে তৈরি গন্ধদ্রব্য বিশেষ যা বাতাসের সংস্পর্শে অল্পক্ষণের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ঋষি — শাস্ত্রজ্ঞ তপস্বী, মুনি, যোগী।

বানভাসি — বন্যায় ভাসানো, বন্যায় যা বা যাদের ভাসিয়ে আনে।

বন্দোবস্ত — ব্যবস্থা, আয়োজন।

অনর্থক — ব্যর্থ, নিষ্ফল, অকারণ।

কুম্ভকর্ণ — রামায়ণে বর্ণিত রাবণের ছোট ভাইয়ের নাম। সে একনাগাড়ে ছয় মাস ঘুমাত। এখানে যে খুব ঘুমায় বা সহজে যাকে জাগানো যায় না।

হুজুগ — সাময়িক আন্দোলন, জনরব, গুজব।

সঙ্কল্প — প্রতিজ্ঞা, শপথ।

স্পিরিট — ইংরেজি Spirit শব্দটির অর্থ উদ্দীপনা, উৎসাহ, শক্তি। এ প্রবন্ধে 'আত্মার শক্তির পবিত্রতা' অর্থে স্পিরিট শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

কল্যকার — পূর্ব বা পরবর্তী দিন। এখানে পূর্বের দিন অর্থে।

লা-পরওয়া — গ্রাহ্য না করা।

দস্তুরমতো — রীতিমতো, যথেষ্ট, নিতান্ত।

সুবর্ণ — সোনা, স্বর্ণ।

পুয়াল — খড়।

দশচক্রে ভগবানভূত — দশজনের চক্রান্তে সাধুও অসাধু প্রতিপন্ন হতে পারে, বহুলোকের ষড়যন্ত্রে অসম্ভবও সম্ভব হয়।

কাণ্ডাকাণ্ড — ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দ।

উদ্‌মো ষাঁড় — বন্ধনমুক্ত ষাঁড়।

প্ররোচনা — উসকানি, উত্তেজনা সৃষ্টি।

২০১৬

নমুনা প্রশ্ন

পাঠের উদ্দেশ্য

রচনাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা মহৎ কাজের জন্য অনুপ্রাণিত হবে। শুধু ভাবের উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হওয়া নয়, ভাবের সঙ্গে পরিকল্পিত কর্মশক্তি ও বাস্তব উদ্যোগের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হবে।

পাঠ-পরিচিতি

ভাব ও কাজের মধ্যে পার্থক্য অনেক। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ভাবের গুরুত্ব অপরিসীম কিন্তু শুধু ভাব দিয়ে মহৎ কিছু অর্জন করা যায় না। তার জন্য কর্মশক্তি এবং সঠিক উদ্যোগের দরকার হয়। ভাবের দ্বারা মানুষকে জাগিয়ে তোলা যায় কিন্তু যথাযথ পরিকল্পনা ও কাজের স্পৃহা ছাড়া যে কোনো ভালো উদ্যোগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ রচনাটিতে লেখক দেশের উন্নতি ও মুক্তি এবং মানুষের কল্যাণের জন্য ভাবের সঙ্গে বাস্তবধর্মী কর্মে তৎপর হওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন।

লেখক-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করতে পারেন নি। দশম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে তিনি স্কুল ছেড়ে বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন। যুদ্ধ শেষ হলে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয়। নজরুল কলকাতায় ফিরে এসে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হলে চারদিকে সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কবিতায় পরাধীনতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উচ্চারিত হয়েছে। অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি প্রবল প্রতিবাদ করেন। এজন্য তাঁকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। তাঁর রচনাবলি অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কবিতা, সংগীত, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও গল্প—সাহিত্যের সকল শাখায় আমরা তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল পরিচয় পেয়ে থাকি। তিনি সাম্যবাদী চেতনাভিত্তিক কবিতা, শ্যামাসংগীত, ইসলামি গান ও গজল লিখে প্রশংসা পেয়েছেন। তিনি আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারে কুশলতা দেখিয়েছেন। দুর্ভাগ্য যে, মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁর সাহিত্যসাধনায় ছেদ ঘটে। ১৯৭২ সালে কবিকে সপরিবারে স্বাধীন বাংলাদেশে আনা হয়। ১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি বাংলাদেশেরর নাগরিকত্ব ও একুশে পদক পান। তিনি আমাদের জাতীয় কবি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে, কাব্যগ্রন্থ : 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'চক্রবাক'; উপন্যাস : 'মৃত্যুক্ষুধা', 'কুহেলিকা'; গল্পগ্রন্থ : 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন' 'শিউলিমালা' ; প্রবন্ধগ্রন্থ : 'যুগবাণী', 'রুদ্র-মঙ্গল' ; নাটক : 'ঝিলিমিলি', 'আলেয়া', 'মধুমালা' ইত্যাদি। কবি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. 'আত্মার শক্তি' বিষয়ে একটি গল্প রচনা কর (একক কাজ)।

খ. পুষ্পবিহীন সৌরভ এবং সৌরভবিহীন পুষ্প-এর পার্থক্য বিষয়ে পরিবেশনযোগ্য নাটিকা লিখে অভিনয় করে দেখাও (দলগত কাজ)।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'ভাব ও কাজ'- লেখাটি কোন ধরনের সাহিত্য ?

ক. ছোটগল্প খ. প্রবন্ধ
গ. কাহিনী কাব্য ঘ. উপন্যাস

২. "সে ভাবাবেশ কর্পূরের মতো উড়িয়া যায়"– বাক্যটির 'কর্পূর' শব্দের অর্থ নিচের কোনটি?

ক. কপালের রেখা
খ. এক ধরনের পাখি বিশেষ
গ. বাতাসের সংস্পর্শে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এমন বস্তু
ঘ. বাতাসের সংস্পর্শে অল্পক্ষণের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এমন বস্তু

৩. 'ভাবের সুরা পান করো ভাই, কিন্তু জ্ঞান হারাইওনা।' জ্ঞান হারালে–

i. দেশের পতন হবে
ii. নিজের পতন হবে
iii. মনুষ্যত্বের পতন হবে

কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জুয়েল ৮ম শ্রেণিতে পড়ে। সে ক্লাসে সবসময় চুপচাপ থাকে। দেখলে মনে হয় কী যেন চিন্তা করছে। ক্লাসের পড়াও ঠিকমত শিখেনা। কিন্তু তার স্বপ্ন এস.এস.সি পরীক্ষার পর একটি ভালো কলেজে ভর্তি হবে।

৪. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধ অনুযায়ী জুয়েলের আচরণ হচ্ছে–

ক. পুষ্পহীন সৌরভ খ. সৌরভহীন পুষ্প
গ. বদ খেয়াল ঘ. লা-পরওয়া

৫. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধ অনুযায়ী জুয়েলের উচিত–

i. ভাব ও কাজের সমন্বয় করা
ii. ভাবের উচ্ছ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করা
iii. বাস্তবধর্মী কাজে তৎপর হওয়া

কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০১৯

সৃজনশীল প্রশ্ন

তুমি স্বপ্নে রাজা হতে পার, কোটি কোটি টাকা, বাড়ি-গাড়ির মালিক হতে পার। কল্পলোকের সুন্দর গল্পও হতে পার, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন এক জগৎ। এখানে বড় হতে হলে পরিশ্রমের বিকল্প নেই। শিক্ষার দ্বারা নিজের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে সঠিক কর্মানুশীলনের মাধ্যমে বড় হতে হবে। সুতরাং কল্পনার জগতে হাবু-ডুবু না খেয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

ক. যিনি ভাবের বাঁশি বাজিয়ে জনসাধারণকে নাচাবেন তাকে কেমন হতে হবে?

খ. লেখক 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে বলেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের যে দিকটি নির্দেশ করে তা বর্ণনা কর।

ঘ. 'কল্পনার জগতে হাবু-ডুবু না খেয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক'– মন্তব্যটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর।

পড়ে পাওয়া

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

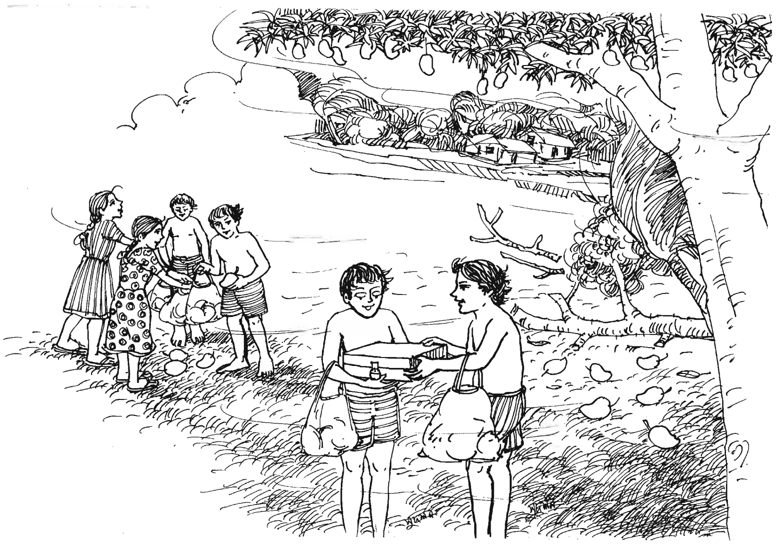

কালবৈশাখীর সময়টা। আমাদের ছেলেবেলার কথা। বিধু, সিধু, নিধু, তিনু, বাদল এবং আরও অনেকে দুপুরের বিকট গরমের পর নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছি। বেলা বেশি নেই। বিধু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে বড়। সে হঠাৎ কান খাড়া করে বললে—ঐ শোন—আমরা কান খাড়া করে শুনবার চেষ্টা করলাম। কিছু শুনতে বা বুঝতে না পেরে বললাম—কী রে? বিধু আমাদের কথার উত্তর দিলে না। তখনো কান খাড়া করে রয়েছে। হঠাৎ আবার সে বলে উঠল—ঐ-ঐ-শোন—আমরাও এবার শুনতে পেয়েছি—দূর পশ্চিম-আকাশে ক্ষীণ গুড়গুড় মেঘের আওয়াজ। নিধু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—ও কিছু না—বিধু ধমক দিয়ে বলে উঠল—কিছু না মানে? তুই সব বুঝিস কিনা? বৈশাখ মাসে পশ্চিম দিকে ওরকম মেঘ ডাকার মানে তুই কিছু জানিস? ঝড় উঠবে। এখন জলে নামব না। কালবৈশাখী। আমরা সকলে ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি ও কী বলছে। কালবৈশাখীর ঝড় মানেই আম কুড়ানো! বাড়ুয্যেদের মাঠের বাগানে চাঁপাতলীর আম এ অঞ্চলে বিখ্যাত। মিষ্টি কী! এই সময়ে পাকে। ঝড় উঠলে তার তলায় ভিড়ও তেমনি। যে আগে গিয়ে পৌঁছতে পারে তারই জয়। সবাই বললাম—তবে থাক। কিন্তু তখনো রোদ গাছপালার মাথায় দিব্যি রয়েছে। আমাদের অনেকের মনের সন্দেহ তখনো দূর হয় নি। ঝড়-বৃষ্টির লক্ষণ তো কিছু দেখা যাচ্ছে না; তবে বহু দূরাগত ক্ষীণ মেঘের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওরই ক্ষীণ সূত্র ধরে বোকার মতো চাপাতলীর তলায় যাওয়া কি ঠিক হবে?

বিধু আমাদের সকল সংশয় দূর করে দিলে। যেমন সে চিরকাল আমাদের সকল সংশয় দূর করে এসেছে। সে জানিয়ে দিলে যে, সে নিজে এখুনি চাঁপাতলীর আমতলায় যাচ্ছে, যার ইচ্ছে হবে সে ওর সঙ্গে যেতে পারে।

এরপর আর আমাদের সন্দেহ রইল না। আমরা সবাই ওর সঙ্গে চললাম।

অল্পক্ষণ পরেই প্রমাণ হলো, ও আমাদের চেয়ে কত বিজ্ঞ। ভীষণ ঝড় উঠল, কালো মেঘের রাশি উড়ে আসতে লাগল পশ্চিম থেকে। বড় বড় গাছের মাথা ঝড়ের বেগে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল, ধুলোতে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল, একটু পরেই ঠান্ডা হাওয়া বইল, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে পড়তে চড় চড় করে ভীষণ বাদলের বর্ষা নামল।

বড় বড় আমবাগানের তলাগুলি ততক্ষণে ছেলেমেয়েতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আম ঝরছে শিলাবৃষ্টির মতো; প্রত্যেক ছেলের হাতে এক এক বোঝা আম। আমরাও যথেষ্ট আম কুড়ুলাম, আমের ভারে নুয়ে পড়লাম এক একজন। ভিজতে ভিজতে কেউ অন্য তলায় চলে গেল, কেউ বাড়ি চলে গেল আমের বোঝা নামিয়ে রেখে আসতে। আমি আর বাদল সন্ধ্যের অন্ধকারে নদীর ধারের পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছি। পথে কেউ কোথাও নেই, ছোট-বড় ডালপালা পড়ে পথ ঢেকে গিয়েছে; পাকা নোনাসুদ্ধ নোনাগাছের ডাল কোথা থেকে উড়ে এসে পড়েছে, কাঁটাওয়ালা সাঁইবাবলার ডালে পথ ভর্তি, কাঁটা ফুটবার ভয়ে আমরা ডিঙিয়ে পথ চলছি আধ–অন্ধকারের মধ্যে।

এমন সময় বাদল কী একটা পায়ে বেধে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। আমায় বললে—দ্যাখ তো রে জিনিসটা কী?

আমি হাতে তুলে দেখলাম একটি টিনের বাক্স, চাবি বন্ধ। এ ধরনের টিনের বাক্সকে পাড়াগাঁ অঞ্চলে বলে, ডবল টিনের ক্যাশ বাক্স। টাকাকড়ি রাখে পাড়াগাঁয়ে। এ আমরা জানি।

বাদল হঠাৎ বড় উত্তেজিত হয়ে পড়ল। বললে—দেখি জিনিসটা?

— দ্যাখ তো, চিনিস?

— চিনি, ডবল টিনের ক্যাশ বাক্স।

— টাকাকড়ি থাকে।

— তাও জানি।

— এখন কী করবি?

— সোনার গহনাও থাকতে পারে। ভারী দেখেছিস কেমন?

— তা তো থাকেই। টাকা গহনা আছেই এতে।

টিনের ক্যাশ বাক্স হাতে আমরা দুজনে সেই অন্ধকারে তেঁতুলতলায় বসে পড়লাম। দুজনে এখন কী করা যায় তাই ঠিক করতে হবে এখানে বসে। আম যে প্রিয় বস্তু, এত কষ্ট করে জল-ঝড় অগ্রাহ্য করে যা কুড়িয়ে এনেছি, তাও একপাশে অনাদৃত অবস্থায় পড়েই রইল, থলেতে বা দড়ির বোনা গেঁজেতে।

বাদল বললে—কেউ জানে না যে আমরা পেয়েছি—

— তা তো বটেই। কে জানবে আর।

— এখন কী করা যায় বল।

— বাক্স তো তালাবন্ধ—

— এখুনি ইট দিয়ে ভাঙি যদি বলিস তো—ও, না জানি কত কী আছে রে এর মধ্যে। তুই আর আমি দুজনে নেব, আর কেউ না। খুব সন্দেশ খাব।

ঝড়ের ঝাপটা আবার এলো। আমরা তেঁতুলগাছের গুঁড়িটার আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। তেঁতুলগাছে ভূত আছে সবাই জানে। কিন্তু ভূতের ভয় আমাদের মন থেকে চলে গিয়েছে। অন্য দিনে আমাদের দুজনের সাধ্য ছিল না এ সময় এ গাছতলায় বসে থাকি।

বাদল বলল—শীতে কেঁপে মরছি। কী করা যাবে বল। বাড়ি কিন্তু নিয়ে যাওয়া হবে না। তাহলে সবাইকে ভাগ দিতে হবে, সবাই জেনে যাবে। কী করবি?

— আমার মাথায় কিছু আসছে না রে।

— ভাঙি তালা। ইট নিয়ে আসি, তুই থাক এখানে।

— না। তালা ভাঙিসনে। ভাঙলেই তো গেল। অন্যায় কাজ হয় তালা ভাঙলে, ভেবে দ্যাখ। কোনো গরিব লোকের হয়তো। আজ তার কী কষ্ট হচ্ছে, রাতে ঘুম হচ্ছে না। তাকে ফিরিয়ে দেব বাক্সটা।

বাদল ভেবে বললে—ফেরত দিবি?

— দেব ভাবছি।

— কী করে জানবি কার বাক্স?

— চল, সে মতলব বার করতে হবে। অধর্ম করা হবে না।

এক মুহূর্তে দুজনের মনই বদলে গেল। দুজনেই হঠাৎ ধার্মিক হয়ে উঠলাম। বাক্স ফেরত দেয়ার কথা মনে আসতেই

২০১৬

আমাদের অদ্ভুত পরিবর্তন হলো। বাক্স নিয়ে জল-ঝড়ে ভিজে সন্ধ্যার পর অন্ধকারে বাড়ি চলে এলাম। বাদলদের বাড়ির বিচুলিগাদায় লুকিয়ে রাখা হলো বাক্সটা। তারপর আমাদের দলের এক গুপ্ত মিটিং বসল বাদলদের ভাঙা নাটমন্দিরের কোণে। বর্ষার দিন—আকাশ মেঘে মেঘাচ্ছন্ন। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম। সেই কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টির পরই বাদলা নেমে গিয়েছে। একটা চাঁপাগাছের ফোটা চাঁপাফুল থেকে বর্ষার হাওয়ার সঙ্গে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। ব্যাঙ ডাকছে নরহরি বোস্টমের ডোবায়।

আমাদের দলের সর্দার বিধুর নির্দেশমতো এ মিটিং বসেছিল। বাক্স ফেরত দিতেই হবে– এ আমাদের প্রথম ও শেষ প্রস্তাব। মিটিং-এ সে প্রস্তাব পেশ করার আগেই মনে মনে আমরা সবাই সেটি মেনেই নিয়েছিলাম। বিধুকে বলা হলো বাক্স ফেরত দেয়া সম্বন্ধে আমরা সকলেই একমত, অতএব এখন উপায় ঠাওরাতে হবে বাক্সের মালিককে খুঁজে বের করার। কারও মাথায় কিছু আসে না। এ নিয়ে অনেক কল্পনা-জল্পনা হলো। যে কেউ এসে বলতে পারে বাক্স আমার। কী করে আমরা প্রকৃত মালিককে খুঁজে বার করব? মস্ত বড় কথা। কোনো মীমাংসাই হয় না।

অবশেষে বিধু ভেবে ভেবে বললে—মতলব বার করিছি। ঘুড়ির মাপে কাগজ কেটে নিয়ে আয় দিকি।

বলেছি—বিধুর হুকুম অমান্য করার সাধ্য আমাদের নেই। দু-তিনখানা কাগজ ঐ মাপে কেটে ওর সামনে হাজির করা হলো।

বিধু বললে—লেখ—বাদল লিখুক। ওর হাতের লেখা ভালো।

বাদল বলল—কী লিখব বলো—

— লেখ বড় বড় করে। বড় হাতের লেখার মতো। বুঝলি? আমি বলে দিচ্ছি—

— বলো—

— আমরা একটা বাক্স কুড়িয়ে পেয়েছি। যার বাক্স তিনি রায়বাড়িতে খোঁজ করুন। ইতি – বিধু, সিধু, নিধু, তিনু।

আমি আর বাদল আপত্তি করে বললাম—বারে, আমরা কুড়িয়ে পেলাম, আর আমাদের নাম থাকবে না বুঝি? আমাদের ভালো নাম লেখ।

বিধু বললে—লিখে দাও। ভালোই তো। ভালো নাম সবারই লেখ।

তিনখানা কাগজ লিখে নদীর ধারের রাস্তায় ভিন্ন ভিন্ন গাছে বেলের আঠা দিয়ে মেরে দেয়া হলো।

দু-তিন দিন কেটে গেল।

কেউ এল না।

তিন দিন পরে একজন কালোমতো রোগা লোক আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে এসে দাঁড়াল। আমি তখন সেখানে বসে পড়ছি। বললাম—কী চাও?

— বাবু, ইদিরভীষণ কার নাম?

— আমার নাম। কেন? কী চাই?

— একটা বাক্স আপনারা কুড়িয়ে পেয়েছেন?

আমার নামের বিকৃত উচ্চারণ করাতে আমি চটে গিয়েছি তখন। বিরক্তিভাবে বললাম—কী রকম বাক্স?

— কাঠের বাক্স।

— না। যাও।

— বাবু, কাঠের নয়, টিনের বাক্স।

— কী রঙের টিন?

— কালো।

— না। যাও—

— বাবু দাঁড়ান, বলছি। মোর ঠিক মনে হচ্ছে না। এই রাঙা মতো—

— না, তুমি যাও।

লোকটা অপ্রতিভভাবে চলে গেল। বিধুকে খবরটা দিতে সে বললে—ওর নয় রে। লোভে পড়ে এসেছে। ওর মতো কত লোক আসবে।

আবার তিন-চার দিন কেটে গেল।

বিধুর কাছে একজন লোক এলো তারপরে। তারও বর্ণনা মিলল না; বিধু তাকে পত্রপাঠ বিদায় দিলে । যাবার সময় সে নাকি শাসিয়ে গেল, চৌকিদারকে বলবে, দেখে নেবে আমাদের ইত্যাদি। বিধু তাচ্ছিল্যের সুরে বললে– যাও যাও, যা পার করো গিয়ে। বাক্স আমরা কুড়িয়ে পাইনি। যাও।

আর কোনো লোক আসে না।

বর্ষা পড়ে গেল।

সেবার আমাদের নদীতে এলো ভীষণ বন্যা।

বড় বড় গাছ ভেসে যেতে দেখা গেল নদীর স্রোতে। দু একটা গরুও আমরা দেখলাম ভেসে যেতে। অম্বরপুর চরের কাপালিরা নিরাশ্রয় হয়ে গেল। নদীর চরে ওদের ছোট ছোট ঘরবাড়ি সেবারেও দেখে এসেছি—কী চমৎকার পটলের আবাদ, কুমড়োর ক্ষেত, লাউ-কুমড়োর মাচা ওদের চরে! দু পয়সা আয়ও পেত তরকারি বেচে। কোথায় রইল তাদের পটল-কুমড়োর আবাদ, কোথায় গেল তাদের বাড়িঘর। আমাদের ঘাটের সামনে দিয়ে কত খড়ের চালাঘর ভেসে যেতে দেখলাম। সবাই বলতে লাগল অম্বরপুর চরের কাপালিরা সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে।

একদিন বিকেলে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে একটা লোক এলো। বাবা বসে হাত-বাক্স সামনে নিয়ে জমাজমির হিসেব দেখছেন। গ্রামের ভাদুই কুমোর কুয়ো কাটানোর মজুরি চাইতে এসেছে। আরও দু-একজন প্রজা এসেছে খাজনা পত্তর দিতে। আমরা দু ভাই বাবার কড়া শাসনে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছি। এমন সময় একটা লোক এসে বললে—দণ্ডবৎ হই, ঠাকুরমশায়।

বাবা বললেন—এসো। কল্যাণ হোক। কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

— আজ্ঞে অম্বরপুর থেকে। আমরা কাপালি।

— বোসো। কী মনে করে? তামাক খাও। সাজো।

লোকটা তামাক সেজে খেতে লাগল। সে এসেছে এ গাঁয়ে চাকরির খোঁজে। বন্যায় নিরাশ্রয় হয়ে নির্বিষখোলার গোয়ালাদের চালাঘরে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছে। এই বর্ষায় না আছে কাপড়, না আছে ভাত। দু আড়ি ধান ধার দিয়েছিল গোয়ালারা দয়া করে, সেও এবার ফুরিয়ে এলো। চাকরি না করলে স্ত্রী-পুত্র না খেয়ে মরবে।

বাবা বললেন—আজ এখানে দুটি ডাল-ভাত খেও।

লোকটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—তা খাব। খাচ্ছিই তো আপনাদের। দুরবস্থা যখন শুরু হয় ঠাকুরমশাই, এই গত জষ্টি মাসে নির্বিষখোলার হাট থেকে পটল বেচে ফিরছি; ছোট মেয়েটার বিয়ে দেব বলে গহনা গড়িয়ে আনছিলাম। প্রায় আড়াই শো টাকার গহনা আর পটল বেচা নগদ টাকা পঞ্চাশটি একটা টিনের বাক্সের ভেতর ছিল। সেটা যে হাটের থেকে ফিরবার পথে গরুর গাড়ি থেকে কোথায় পড়ে গেল, তার আর খোঁজই হলো না। সেই হলো শুরু—আর তারপর এলো এই বন্যে—

বাবা বললেন—বল কী? অতগুলো টাকা-গহনা হারালে?

২০১৬ —অদেষ্ট, একেই বলে বাবু অদেষ্ট। আজ সেগুলো হাতে থাকলে—

আমি কান খাড়া করে শুনছিলাম। বলে উঠলাম—কী রঙের বাক্স?

— সবুজ টিনের।

বাবা আমাদের বাক্সের ব্যাপার কিছুই জানেন না। আমায় ধমক দিলেন—তুমি পড়ো না, তোমার সে খোঁজে কী দরকার? কিন্তু আমি ততক্ষণে বইপত্তর ফেলে উঠে পড়েছি। একেবারে এক ছুটে বিধুর বাড়ি গিয়ে হাজির। বিধু আমার কথা শুনে বললে—দাঁড়া, সিধু আর তিনুকেও নিয়ে আসি। ওরা সাক্ষী থাকবে কী না?

বিধুর খুব বুদ্ধি আমাদের মধ্যে। ও বড় হলে উকিল হবে, সবাই বলত।

আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বেশ একটি ছোটখাটো ভিড় জমে গেল। বাক্স ফেরত পেয়ে সে লোকটা যেন কেমন হকচকিয়ে গেল। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কেবল আমাদের মুখের দিকে চায় আর বলে—ঠাকুরমশাই, আপনারা মানুষ না দেবতা? গরিবের ওপর এত দয়া আপনাদের?

বিধু অত সহজে ভুলবার পাত্র নয়। সে বললে—দেখে নাও মাল সব ঠিক আছে কী না আর এই কাকাবাবুর সামনে আমাদের একটা রসিদ লিখে দাও, বুঝলে? কাকাবাবু আপনি একটু কাগজ দিন না ওকে—লিখতে জান তো?

না, ও উকিলই হবে!

আমার বাবা এমন অবাক হয়ে গেলেন ব্যাপার দেখে যে, তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না।

শব্দার্থ ও টীকা

দিব্যি	—	চমৎকার। আশাতীতভাবে।
সংশয়	—	সন্দেহ। দ্বিধা।
গহনা	—	অলংকার।
অনাদৃত	—	অবহেলিত। উপেক্ষিত। গুরুত্ব দেয়া হয়নি এমন।
বিচুলিগাদা	—	ধানের খড়ের স্তূপ।
নাটমন্দির	—	দেবমন্দিরে সামনের ঘর যেখানে নাচ-গান হয়।
বোস্টম	—	হরিনাম সংকীর্তন করে জীবিকা অর্জন করে এমন বৈষ্ণব।
অপ্রতিভভাবে	—	বিব্রত বা লজ্জিতভাবে।
পত্রপাঠ বিদায়	—	তৎক্ষণাৎ বিদায়।
চৌকিদার	—	প্রহরী।
কাপালি	—	তান্ত্রিক হিন্দু সম্প্রদায়।
চণ্ডীমণ্ডপ	—	যে মণ্ডপে বা ছাদযুক্ত চত্বরে দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবীর পূজা হয়।
দণ্ডবৎ	—	মাটিতে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম।
আড়ি	—	ধান, গম ইত্যাদির পরিমাপবিশেষ। ধান মাপার বেতের ঝুড়ি বা পাত্র।

পাঠের উদ্দেশ্য

এই গল্প পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে কর্তব্যপরায়ণতা ও নৈতিক চেতনার সৃষ্টি হবে।

পাঠ-পরিচিতি

এটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত কিশোর গল্প। এটি 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব' গ্রন্থ থেকে সংকলিত। এ গল্পের কিশোররা কুড়িয়ে পাওয়া অর্থ সম্পদ নিয়ে লোভের পরিচয় দেয়নি। বরং তারা তাদের বয়সের চেয়েও অনেক বেশি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন, বয়সে ছোট হলে কী হবে তাদের নৈতিক অবস্থানও বেশ দৃঢ়। এই গল্পে কিশোরদের ঐক্য চেতনার যেমন পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি তাদের উন্নত মানবিক বোধেরও প্রকাশ ঘটেছে। তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তার পাশাপাশি তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে॥ কিশোরদের এমন সততা, নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধে বয়োজ্যেষ্ঠরাও বিস্মিত, অভিভূত। কিশোররা যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তারা তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ও বিবেচক তাকে মান্য করে তার ওপর আস্থা স্থাপন করে। এটি গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। দরিদ্র অসহায় মানুষের প্রতি ভালোবাসার চিত্রও ফুটে উঠেছে এ গল্পে।

লেখক-পরিচিতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে চব্বিশ পরগনা জেলার মুরারিপুর গ্রামে, মাতুলালয়ে। তাঁর পৈতৃক বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর গ্রামে। তাঁর বাল্য ও কৈশোরকাল কেটেছে দারিদ্র্যের মধ্যে। মাতার নাম মৃণালিনী দেবী। পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পেশা ছিল কথকতা ও পৌরোহিত্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পড়াকালে (১৯১৮) তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু ঘটলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অসমাপ্ত থাকে। অতঃপর স্কুল শিক্ষকতাসহ নানা পেশায় তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। এর বাইশ বছর পরে তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন (১৯৪০)। ছোটগল্প, উপন্যাস, দিনলিপি ও ভ্রমণ–কাহিনী রচনার মধ্যেই তিনি জীবনের আনন্দ খুঁজে পান। তাঁর রচিত সাহিত্যে প্রকৃতি ও মানবজীবন এক অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন সত্তায় সমন্বিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য ও গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবনাচরণের সজীব ও নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' উপন্যাস যেমন তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি তেমনি বাংলা সাহিত্যেরও অমূল্য সম্পদ। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : 'আরণ্যক', 'ইছামতী'; গল্পগ্রন্থ : 'মেঘমল্লার', 'মৌরীফুল'; ভ্রমণ-দিনলিপি : 'তৃণাঙ্কুর', 'স্মৃতির রেখা'; কিশোর উপন্যাস : 'চাঁদের পাহাড়', 'মিসমিদের কবচ', 'হীরামানিক জ্বলে'। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

কর্ম-অনুশীলন

ক. ভালো কাজ করলে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার পক্ষে তোমার অনুভূতি ব্যক্ত কর (একক কাজ)।

খ. অন্যের হারিয়ে যাওয়া জিনিস পাওয়ার পর কীভাবে তুমি তা যথার্থ ব্যক্তির কাছে পৌছে দেবে?— এ বিষয় অবলম্বনে একটি গল্প লেখ (একক কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কাদের বাগানে আম কুড়াতে কালবৈশাখী উপেক্ষা করে সবাই ছুটছিল?

ক. চাটুয্যেদের খ. মুখুয্যেদের

গ. বাড়ুয্যেদের ঘ. গাঙ্গুলিদের

২. চাঁপাতলীর আমের ব্যাপারে এত আগ্রহের কারণ তা—

i. প্রচুর পাওয়া যায়

ii. খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু

iii. নির্বিঘ্নে কুড়ানো যায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. iii

৩. লেখকের চমৎকার অর্থে ব্যবহৃত 'দিব্যি' শব্দটি আমরা আর কোন অর্থে ব্যবহার করে থাকি ?

ক. শপথ খ. বিশ্বাস

গ. সংশয় ঘ. অনবরত

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

স্কুলের ঝাড়ুদার শচী। পরীক্ষা শেষে কক্ষ পরিষ্কার করতে গিয়ে সে একটি মূল্যবান ঘড়ি পেল। তার লোভ হলো। ভাবল, ঘড়িটা মেয়ের জামাইকে উপহার দেবে। মেয়ে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে। কিন্তু রাতে ঘুমুতে গিয়ে মনে হলো—এ অন্যায়, অনুচিত। যার ঘড়ি তার মনঃকষ্টের কারণে মেয়ের চরম অকল্যাণ হতে পারে। ঘড়িটা কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া তার কর্তব্য। সে পরদিন তা-ই করল।

৪. শচী 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিভূ ?

ক. বাদল খ. বিধু

গ. কথক ঘ. সিধু

৫. উল্লিখিত তুলনাটা কোন মানদণ্ডে বিচার্য ? উভয়েই—

i. ন্যায় ও কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ

ii. লোকলজ্জার ভয়ে ভীত

iii. অকল্যাণ চিন্তায় তাড়িত

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আরিফ টেক্সি ক্যাব চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। একবার একজন আরোহীকে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে সে বিশ্রাম নিচ্ছিল। সহসা গাড়ির ভিতরে দৃষ্টি পড়তে সে দেখতে পেল একটি মানিব্যাগ সিটের ওপর পড়ে আছে। ব্যাগে অনেকগুলো ডলার। কিন্তু ব্যাগে কেনো ঠিকানা পাওয়া গেল না। সে সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করল। নিরুপায় হয়ে সে পত্রিকা অফিসে গিয়ে সম্পাদককে একটি বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে দেবার অনুরোধ জানায়।

ক. 'পড়ে পাওয়া' কী ধরনের রচনা ?

খ. 'ওর মতো কত লোক আসবে'—বিধুর এ কথাটির অর্থ বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপকের আরিফকে কোন যুক্তিতে বিধুদের সঙ্গে তুলনা করা যায় ?—বুঝিয়ে লেখ।

ঘ. কলেবরে ক্ষুদ্র হলেও আরিফ চরিত্রটি 'পড়ে পাওয়া' গল্পের মূল সুরকেই ধারণ করে আছে।—মূল্যায়ন কর।

২. সন্ধ্যায় দেখা গেল, নিজেদের ছাগলের সাথে অতিরিক্ত একটি ছাগলও আথালে ঢুকছে। এশার নামাজ পার হয়ে গেল, কিন্তু কেউ খোঁজ নিতে এল না। দাদু বললেন, না, না, চুপ করে থাকা ঠিক হবে না। এক কাজ কর, রফিক-শফিক বেরিয়ে পড়। প্রতিবেশী নাবিল আর তালিমকে সাথে নিয়ে দুজন দুদিকে যেও। মসজিদ থেকে চোঙ্গা নিয়ে গাঁয়ে ঘোষণা দিয়ে আস। কিছুক্ষণের মধ্যে দু-ভাই দাদুর পরামর্শ মতো বলতে লাগল, ভাইসব, একটি ছাগল পাওয়া গেছে। যাদের ছাগল তারা দয়া করে মতিন শিকদারের বাড়ি থেকে নিয়ে যান।

ক. লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন ধরনের লেখক হিসেবে সমধিক পরিচিত ?

খ. 'দুজনই হঠাৎ ধার্মিক হয়ে উঠলাম।' কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে ?

গ. রফিক-শফিকের চোঙ্গা ফোঁকার ঘটনাটি 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কোন ঘটনার সাথে সংগতিপূর্ণ ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের দাদু যেন 'পড়ে পাওয়া' গল্পের মূল চেতনারই প্রতিভূ। বিশ্লেষণ কর।

তৈলচিত্রের ভূত

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিন সকাল বেলা পরাশর ডাক্তার নিজের প্রকাণ্ড লাইব্রেরিতে বসে চিঠি লিখছিলেন। চোরের মতো নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে নগেন ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তার টেবিল ঘেঁষে দাঁড়াল। পরাশর ডাক্তার মুখ না তুলেই বললেন, বোসো, নগেন। চিঠিখানা শেষ করে খামে ভরে ঠিকানা লিখে সেটি ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে তবে আবার নগেনের দিকে তাকালেন।

'বসতে বললাম যে? এ রকম চেহারা হয়েছে কেন? অসুখ নাকি?'

নগেন ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। চোরকে যেন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সে চুরি করে কিনা, এইরকম অতিমাত্রায় বিব্রত হয়ে সে বলল, 'না না, অসুখ নয়, অসুখ আবার কিসের।'

গুরুতর কিছু ঘটেছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে পরাশর ডাক্তার দুহাতের আঙুলের ডগাগুলি একত্র করে নগেনকে দেখতে লাগলেন। মোটাসোটা হাসিখুশি ছেলেটার তেল চকচকে চামড়া পর্যন্ত যেন শুকিয়ে গেছে, মুখে হাসির চিহ্নটুকুও নেই। চাউনি একটু উদভ্রান্ত। কথা বলার ভঙ্গি পর্যন্ত কেমন খাপছাড়া হয়ে গেছে।

নগেন তার মামাবাড়িতে থেকে কলেজে পড়ে। মাস দুই আগে নগেনের মামার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে পরাশর ডাক্তার নগেনকে দেখেছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন কী ঘটেছে যাতে ছেলেটা এরকম বদলে যেতে পারে? ছেলেবেলা থেকে মামাবাড়িতেই সে মানুষ হয়েছে বটে কিন্তু মামার শোকে এরকম কাহিল হয়ে পড়ার মতো আকর্ষণ তো মামার জন্য তার কোনো দিন ছিল না। বড়লোক কৃপণ মামার যে ধরনের আদর বেচারি চিরকাল পেয়ে এসেছে তাতে মামার পরলোক যাত্রায় তার খুব বেশি দুঃখ হবার কথা নয়। বাইরে মামাকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি দেখালেও মনে মনে নগেন যে তাকে প্রায়ই যমের বাড়ি পাঠাত তাও পরাশর ডাক্তার ভালো করেই জানতেন। পড়ার খরচের জন্য দুশ্চিন্তা

হওয়ার কারণও নগেনের নেই, কারণ শেষ সময়ে কী ভেবে তার মামা তার নামে মোটা টাকা উইল করে রেখে গেছেন। নগেন হঠাৎ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'ডাক্তার কাকা, সত্যি করে একটা কথা বলবেন? আমি কী পাগল হয়ে গেছি?' পরাশর ডাক্তার একটু হেসে বললেন, 'তোমার মাথা হয়ে গেছ। পাগল হওয়া কী মুখের কথা রে বাবা! পাগল যে হয় অত সহজে সে টের পায় না সে পাগল হয়ে গেছে।'

'তবে'—দ্বিধা ভরে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ নগেন যেন মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'আচ্ছা ডাক্তার কাকা, প্রেতাত্মা আছে?'

'প্রেতাত্মা মানে তো ভূত ? নেই।'

'নেই? তবে'—

অনেকক্ষণ ইতস্তত করে, অনেক ভূমিকা করে, অনেকবার শিউরে উঠে নগেন ধীরে ধীরে আসল ব্যাপারটা খুলে বলল। চমকপ্রদ অবিশ্বাস্য কাহিনি। বিশ্বাস করা শক্ত হলেও পরাশর ডাক্তার বিশ্বাস করলেন। মিথ্যা গল্প বানিয়ে তাকে শোনাবার ছেলে যে নগেন নয়, তিনি তা জানতেন।

মামা তাকেও প্রায় নিজের ছেলেদের সমান টাকাকড়ি দিয়ে গেছেন জেনে প্রথমটা নগেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। মামার এরকম উদারতা সে কোনো দিন কল্পনাও করতে পারে নি। বাইরে যেমন ব্যবহারই করে থাকুন, মামা তাকে নিজের ছেলেদের মতোই ভালোবাসতেন জেনে পরলোকগত মামার জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তিতে তার মন ভরে গেল। আর সেই সঙ্গে জাগল এরকম দেবতার মতো মানুষকে সারা জীবন ভক্তি-ভালোবাসার ভান করে ঠকিয়েছে ভেবে দারুণ লজ্জা আর অনুতাপ। শ্রাদ্ধের দিন অনেক রাত্রে বিছানায় শুতে যাওয়ার পর অনুতাপটা যেন বেড়ে গেল—শুয়ে শুয়ে সে ছটফট করতে লাগল। হঠাৎ এক সময় তার মনে হলো, সারা জীবন তো ভক্তি-শ্রদ্ধার ভান করে মামাকে সে ঠকিয়েছে, এখন যদি সত্য সত্যই ভক্তি-শ্রদ্ধা জেগে থাকে লাইব্রেরি ঘরে মামার তৈলচিত্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে এলে হয়তো আত্মগ্লানি একটু কমবে, মনটা শান্ত হবে।

রাত্রি তখন প্রায় তিনটে বেজে গেছে, সকলে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে, বাড়ি অন্ধকার। এত রাত্রে ঘুমানোর বদলে মামার তৈলচিত্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করার জন্য বিছানা ছেড়ে উঠে যাওয়াটা যে রীতিমতো খাপছাড়া ব্যাপার হবে সে জ্ঞান নগেনের ছিল। তাই কাজটা সকালের জন্য স্থগিত রেখে সে ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু তখন তার মাথা গরম হয়ে গেছে। মন একটু শান্ত না হলে যে ঘুম আসবার কোনো সম্ভাবনা নেই, কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করার পর সেটা ভালো করেই টের পেয়ে শেষকালে মরিয়া হয়ে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল।

লাইব্রেরিটি নগেনের দাদামশায়ের আমলের। লাইব্রেরি সম্পর্কে নগেনের মামার বিশেষ কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তার আমলে গত ত্রিশ বছরের মধ্যে লাইব্রেরির পিছনে একটি পয়সাও খরচ করা হয়েছে কিনা সন্দেহ। আলমারি কয়েকটি অল্প দামি আর অনেক দিনের পুরোনো, ভেতরগুলি বেশির ভাগ অদরকারি বাজে বইয়ে ঠাসা এবং উপরে বহুকালের ছেঁড়া মাসিকপত্র আর নানা রকম ভাঙাচোরা ঘরোয়া জিনিস গাদা করা। টেবিলটি এবং চেয়ার কয়েকটি খুব সম্ভব অন্য ঘর থেকে পেনশন পেয়ে এ ঘরে স্থান পেয়েছে। দেয়ালে তিনটি বড় বড় তৈলচিত্র, সস্তা ফ্রেমে বাঁধানো কয়েকটা সাধারণ রঙিন ছবি ও ফটো টাঙানো। তা ছাড়া কয়েকটা পুরানো ক্যালেন্ডারের ছবিও আছে—কোনোটাতে ডিসেম্বর, কোনোটাতে চৈত্রমাসের বারো তারিখ লেখা কাগজের ফলক এখনো ঝুলছে।

তৈলচিত্রের একটি নগেনের দাদামশায়ের, একটি দিদিমার এবং অপরটি তার মামার। দাদামশায় আর দিদিমার তৈলচিত্র দুটি একদিকের দেয়ালে পাশাপাশি টাঙানো আছে, মামার তৈলচিত্রটি স্থান জুড়ে আছে পাশের দেয়ালের মাঝামাঝি।

কারো ঘুম ভেঙে যাবে ভয়ে নগেন আলো জ্বালে নি। কিন্তু তাতে তার কোনো অসুবিধা ছিল না, ছেলেবেলা থেকে এ বাড়ির আনাচ-কানাচের সঙ্গে তার পরিচয়। লাইব্রেরিতে ঢুকে অন্ধকারেই সে মামার তৈলচিত্রের কাছে এগিয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে 'আমায় ক্ষমা করো মামা' বলে যেই সে তৈলচিত্রের পায়ের কাছে আন্দাজে স্পর্শ করেছে—বর্ণনার এখানে পৌঁছে নগেন শিউরে চুপ করে গেল। তার মুখ আরও বেশি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, দুচোখ বিস্ফোরিত।

২০১৬

'তারপর?'

নগেন ঢোক গিলে জিভ দিয়ে ঠোঁট চেপে বলল, 'যেই ছবি ছুঁয়েছি ডাক্তার কাকা, কে যেন আমাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল। সমস্ত শরীর ঝনঝন করে উঠল তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান হতে দেখি, সকাল হয়ে গেছে, আমি মামার ছবির নিচে মেঝেতে পড়ে আছি।'

পরাশর ডাক্তার গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার আগে কোনো দিন ফিট হয়েছিল নগেন?'

নগেন মাথা নেড়ে বলল 'ফিট? না, কস্মিনকালেও আমার ফিট হয় নি। আপনি ভুল করেছেন ডাক্তার কাকা, এ ফিট নয়, মরলে তো মানুষ সব জানতে পারে, মামাও জানতে পেরেছেন টাকার লোভে আমি মিথ্যা ভক্তি দেখাতাম। তাই ছবি ছোঁয়ামাত্র রাগে ঘেন্নায় আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন। সবটা শুনুন আগে, তা হলে বুঝতে পারবেন।'

সমস্ত সকাল নগেন মড়ার মতো বিছানায় পড়ে রইল। এই চিন্তাটাই কেবল তার মনে ঘুরপাক খেতে লাগল, ভক্তি ভালোবাসার ছলনায় টাকা আদায় করে নিয়েছে বলে পরলোকে গিয়েও তার ওপর মামার এখন জোরালো বিতৃষ্ণা জেগেছে যে তার তৈলচিত্রটি পর্যনত তিনি তাকে স্পর্শ করতে দিতে রাজি নন। যাই হোক, নগেন একালের ছেলে, প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর তার মনে নানারকম দ্বিধা-সন্দেহ জাগতে লাগল। কে জানে রাত্রে যা ঘটেছে তা নিছক স্বপ্ন কিনা। ধৈর্য ধরতে না পেরে দুপুরবেলা সে আবার লাইব্রেরিতে গিয়ে মামার তৈলচিত্র স্পর্শ করে প্রণাম করল। একবার যদি মামা রাগ দেখিয়ে থাকেন, আবার দেখাবেন না কেন?

এবার কিছুই ঘটল না। শরীরটা অবশ্য খুব খারাপ হয়ে আছে, মেঝেতে ধাক্কা যেখানে লেগেছিল মাথার সেখানটা ফুলে টনটন করছে এবং সকালে লাইব্রেরিতে মামার তৈলচিত্রের নিচে মেঝেতেই তার জ্ঞান হয়েছিল। কিন্তু এতে বড়জোর প্রমাণ হয়, রাত্রে ঘুমের মধ্যেই হোক আর জাগ্রত অবস্থাতেই হোক লাইব্রেরিতে গিয়ে সে একটা আছাড় খেয়েছিল। নিজের তৈলচিত্রে ভর করে মামাই যে তাকে ধাক্কা দিয়েছিলেন তার কী প্রমাণ আছে?

নগেন যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। কিন্তু বেশিক্ষণ তার মনের শান্তি টিকল না। রাত্রে আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়েই হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, তার তো ভুল হয়েছে। দিনের বেলা তাকে ধাক্কা দেয়ার ক্ষমতা তো তার মামার এখন নেই, রাত্রি ছাড়া তার মামা তো এখন কিছুই করতে পারেন না! কী সর্বনাশ! তবে তো রাত্রে আরেকবার মামার তৈলচিত্র না ছুঁয়ে কাল রাত্রের ব্যাপারকে স্বপ্ন বলা যায় না।

এত রাত্রে আবার লাইব্রেরিতে যাওয়ার কথা ভেবেই নগেনের হৃৎকম্প হতে লাগল। কিন্তু এমন একটা সন্দেহ না মিটিয়েই বা মানুষের চলে কী করে? খানিকটা পরে নগেন আবার লাইব্রেরিতে হাজির। ভয়ে বুক কাঁপছে, ছুটে পালাতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু কী এক অদম্য আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে চলেছে মামার তৈলচিত্রের দিকে। ঘরে ঢুকেই সে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল। মটকার পাঞ্জাবির ওপর দামি শাল গায়ে মামা দেয়ালে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, মুখে একজোড়া মোটা গোঁফ, চোখে ভর্ৎসনার দৃষ্টি। নগেন এগিয়ে গিয়ে মামার পায়ের কাছে ছবি স্পর্শ করল। কেউ তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল না, কিন্তু সমস্ত শরীর হঠাৎ যেন কেমন অস্থির-অস্থির করতে লাগল। তৈলচিত্র থেকে কী যেন তার মধ্যে প্রবেশ করে ভেতর থেকে তাকে কাঁপিয়ে তুলছে।

তবু নগেন যেন বাঁচল। ভয়ের জন্য শরীর এরকম অস্থির-অস্থির করতে পারে। সেটা সামান্য ব্যাপার।

ফিরে যাওয়ার সময় আলোটা নিভিয়েই নগেন আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার আরেকটা কথা মনে এসেছে। কাল ঘর অন্ধকার ছিল, আজ আলোটা থাকার জন্য যদি মামা কিছু না করে থাকেন? নগেনের ভয় অনেকটা কমে গিয়েছিল, অনেকটা নিশ্চিন্ত মনেই সে অন্ধকারে তৈলচিত্রের কাছে ফিরে গেল। সে জানে অন্ধকারে তৈলচিত্র স্পর্শ করলেও কিছু হবে না। ঘরে একটা আলো জ্বলছে কি জ্বলছে না তাতে বিশেষ কী আসে যায়? ইতস্তত না করেই সে সোজা তৈলচিত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। পরক্ষণে—

'ঠিক প্রথম রাত্রের মতো জোরে ধাক্কা দিয়ে মামা আমায় ফেলে দিলেন ডাক্তার কাকা।'

'অজ্ঞান হয়ে গেলে?'

'না, একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাই নি। অবশ্য আচ্ছন্নের মতো অনেকক্ষণ মেঝেতে পড়ে ছিলাম, কিন্তু জ্ঞান ছিল। তারপর থেকে আমি ঠিক পাগলের মতো হয়ে গেছি ডাক্তার কাকা। দিনরাত কেবল এই কথাই ভাবি। রোজ কতবার ঠিক করি বাড়ি ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাব, কিন্তু যেতে পারি না, কিসে যেন আমায় জোর করে আটকে রেখেছে।'

পরাশর ডাক্তার খানিক্ষণ ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর আর কোনো দিন ছবিটা ছুঁয়েছো?'

'কতবার। দিনে ছুঁয়েছি, রাত্রে ছুঁয়েছি, আলো জ্বেলে ছুঁয়েছি, অন্ধকারে ছুঁয়েছি। ঠিক ওইরকম ব্যাপার ঘটে। দিনে বা রাত্রে আলো জ্বেলে ছুঁয়ে কিছু হয় না, অন্ধকারে ছোঁয়ামাত্র মামা আমাকে ঠেলে দেন। সমস্ত শরীর যেন ঝনঝনিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে। কোনো দিন অজ্ঞান হয়ে যাই, কোনো দিন জ্ঞান থাকে।'

বলতে বলতে নগেন যেন একেবারে ভেঙে পড়ল, 'আমি কী করব ডাক্তার কাকা? এমন করে কদিন চলবে?'

পরাশর ডাক্তার বললেন, 'তার দরকার হবে না। আমি সব ঠিক করে দেব। আজ সকলে ঘুমিয়ে পড়লে রাত্রি ঠিক বারোটার সময় তুমি বাইরের ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা কোরো, আমি যাব।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'ভূত বলে কিছু নেই, নগেন।'

তবু মাঝরাত্রে অন্ধকার লাইব্রেরিতে পরাশর ডাক্তার মৃদু একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এ ঘরে বাড়ির লোক খুব কম আসে। ঘরের বাতাসে পুরোনো কাগজের একটা ভাপসা গন্ধ পাওয়া যায়। নগেন শক্ত করে তার একটা হাত চেপে ধরে কাঁপছে। কীসের ভয়? ভূতের? তৈলচিত্রের ভূতের? ভূতে যে একেবারে বিশ্বাস করে না, যার বদ্ধমূল ধারণা এই যে যত সব অদ্ভুত অথচ সত্য ভূতের গল্প শোনা যায় তার প্রত্যেকটির সাধারণ ও স্বাভাবিক কোনো ব্যাখ্যা আছেই আছে, ছবির ভূতের অসম্ভব আর অবিশ্বাস্য ভূতের ঘরে পা দিয়ে তার কখনো কি ভয় হতে পারে? তবু অস্বস্তি যে বোধ হচ্ছে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। নগেন যে কাহিনি শুনিয়েছে, সারা দিন ভেবেও পরাশর ডাক্তার তার কোনো সঙ্গত ব্যাখ্যা কল্পনা করতে পারেন নি। একদিন নয়, একবার নয়, ব্যাপারটা ঘটেছে অনেকবার। দিনে তৈলচিত্র নিস্তেজ হয়ে থাকে, রাত্রে তার তেজ বাড়ে। কেবল তাই নয়, অন্ধকার না হলে সে তেজ সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না। আরও একটা কথা, রাত্রি বাড়ার সঙ্গে তৈলচিত্র যেন বেশি সজীব হয়ে উঠতে থাকে। প্রথম রাত্রে নগেন অন্ধকারে স্পর্শ করলে ছবি নগেনের হাতটা শুধু ছিটকিয়ে সরিয়ে দিয়েছে, মাঝরাত্রে স্পর্শ করলে এত জোরে তাকে ধাক্কা দিয়েছে যে মেঝেতে আছড়ে পড়ে নগেনের জ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে।

অশরীরী শক্তি কল্পনা করা ছাড়া এ সমস্তের আর কী মানে হয়?

হয়—নিশ্চয় হয়; মনে মনে নিজেকে ধমক দিয়ে পরাশর ডাক্তার নিজেকে এই কথা শুনিয়ে দিলেন। তারপর চোখ তুলে তাকালেন দেয়ালের যেখানে নগেনের মামার তৈলচিত্রটি ছিল। এ ঘরে তিনি আগেও কয়েকবার এসেছেন, তৈলচিত্রগুলির অবস্থান তার অজানা ছিল না। যা চোখে পড়ল তাতে পরাশর ডাক্তারের বুকটাও ধড়াস করে উঠল। তৈলচিত্রের দিকে দুটি উজ্জ্বল চোখ তার দিকে জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটির মধ্যে ফাঁক প্রায় দেড় হাত।

ঠিক এই সময় নগেন ফিসফিস করে বলল, 'আলোটা জ্বালব ডাক্তার কাকা?'

পরাশর ডাক্তার তার গলার আওয়াজ শুনেই চমকে উঠলেন—'না।'

রাস্তা অথবা পাশের কোনো বাড়ি থেকে সরু একটা আলোর রেখা ঘরের দেয়ালে এসে পড়েছে। তাতে অন্ধকার কমে নি, মনে হচ্ছে যেন সেই আলোটুকুতে ঘরের অন্ধকারটাই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র।

নগেন আবার ফিসফিস করে বলল, 'একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গেছি ডাক্তার কাকা। দাদামশায় আর দিদিমার ছবি তাঁরা মরবার পর করা হয়েছিল, কিন্তু মামার ছবিটা মরবার আগে মামা নিজে শখ করে আঁকিয়েছিলেন। হয়তো
২০১৬ সেই জন্যেই'—

নগেনের শিহরণ স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। 'ভয় পেয়ে গেছেন?'

দাঁতে দাঁত লাগিয়ে পরাশর ডাক্তার তৈলচিত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন। কাছাকাছি যেতে জ্বলজ্বলে চোখ দুটির জ্যোতি যেন অনেক কমে গেল। হাত বাড়িয়ে দিতে প্রথমে তার হাত পড়ল দেয়ালে। যত সাহস করেই এগিয়ে এসে থাকুন, প্রথমেই একেবারে নগেনের মামার গায়ে হাত দিতে তার কেমন দ্বিধা বোধ হচ্ছিল। পাশের দিকে হাত সরিয়ে তৈলচিত্রের ফ্রেম স্পর্শ করা মাত্র বৈদ্যুতিক আঘাতে যেন তার শরীরটা ঝনঝন করে উঠল। অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ করে পেছন দিকে দু পা ছিটকে দিয়ে তিনি মেঝেতে বসে পড়লেন।

পরক্ষণে ভয়ে অর্ধমৃত নগেন আলোর সুইচ টিপে দিল।

মিনিট পাঁচেক পরাশর ডাক্তার চোখ বুঁজে বসে রইলেন, তারপর চোখ মেলে মিনিট পাঁচেক একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন নগেনের মামার রুপার ফ্রেমে বাঁধানো তৈলচিত্রটির দিকে।

তারপর তীব্র চাপা গলায় তিনি বললেন, 'তুমি একটি আস্ত গর্দভ নগেন।'

রাগ একটু কমলে পরাশর ডাক্তার বলতে লাগলেন, 'গাধাও তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান। এত কথা বলতে পারলে আমাকে আর এই কথাটা একবার বলতে পারলে না যে তোমার মামার ছবিটা ইতোমধ্যে রুপার ফ্রেমে বাঁধানো হয়েছে আর ছবির সঙ্গে লাগিয়ে দুটো ইলেকট্রিক বাল্ব ফিট করা হয়েছে?'

'আমি কি জানি! ছ মাস আগে যেমন দেখে গিয়েছিলাম, আমি ভেবেছিলাম ছবিটা এখানে তেমনি অবস্থাতেই আছে'।

'ইলেকট্রিক শক খেয়ে বুঝতে পারো না কীসে শক লাগল, তুমি কোনদেশি ছেলে? আমি তো শক খাওয়া মাত্র টের পেয়ে গিয়েছিলাম তোমার মামার ছবিতে কোন প্রেতাত্মা ভর করেছেন।'

নগেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলল, 'রুপার ফ্রেমটা দাদামশায়ের ছবিতে ছিল, চুরি যাবার ভয়ে মামা অনেক দিন আগে সিন্ধুকে তুলে রেখেছিলেন। মামার শ্রাদ্ধের দিন মামিমা ফ্রেমটা বার করে মামার ছবিটা বাঁধিয়েছিলেন। আলো দুটো লাগিয়েছে আমার মামাতো ভাই পরেশ।'

'হ্যাঁ। সে এ বছর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে। তাই বলল, এই সামান্য কাজের জন্য ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে পয়সা দেব কেন?'

পরাশর ডাক্তার একটু হেসে বললেন, 'পরেশ তোমার মামার উপযুক্ত ছেলেই বটে। কিছু পয়সা বাঁচানোর জন্য বাপের ছবিতে ভূত এনে ছেড়েছে। এ খবরটা যদি আগে দিতে আমায়'—

নগেন সংশয়ভরে বলল, 'কিন্তু ডাক্তার কাকা'—

পরাশর ডাক্তার রাগ করে বললেন, 'কিন্তু কী? এখনো বুঝতে পারছ না। দিনের বেলা মেন সুইচ অফ করা থাকে, তাই ছবি ছুঁলে কিছু হয় না, ছবি মানে ছবির রুপার ফ্রেমটা। রুপার ফ্রেমটার নিচে কাঠফাট কিছু আছে, দেয়ালের সঙ্গে যোগ নেই, নইলে তোমাদের ইলেকট্রিকের বিল এমন হুহু করে বেড়ে যেত যে আবার কোম্পানির লোককে এসে লিকেজ খুঁজতে হতো। তুমিও আবার ভূতের আসল পরিচয়টা জানতে পারতে। সন্ধ্যার পর বাড়ির সমস্ত আলো জ্বলে আর বিদ্যুৎ তামার তার দিয়ে যাতায়াত করতে বেশি ভালোবাসে কিনা, তাই সে সময় ছবি ছুঁলে তোমার কিছু হয় না। এ ঘরের আলোটা জ্বাললেও তাই হয়। মাঝরাত্রে বাড়ির সমস্ত আলো নিভে যায়, তখন ছবিটা ছুঁলে আর কোনো পথ খোলা নেই দেখে বিদ্যুৎ অগত্যা তোমার মতো বোকা হাবার শরীরটা দিয়েই'—

পরাশর ডাক্তার চুপ করে গেলেন। তার হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, সুযোগ পেলে তার শরীরটা পথ হিসেবে ব্যবহার করতেও বিদ্যুৎ দ্বিধা করে না। তিনি হাঁফ ছাড়লেন। কপাল ভালো তড়িতাহত হয়ে প্রাণে মরতে হয় নি।

শব্দার্থ ও টীকা

প্রকাণ্ড	—	অত্যন্ত বৃহৎ, অতিশয় বড়।
বিব্রত	—	ব্যতিব্যস্ত, ব্যাকুল, বিচলিত।
উদ্‌ভ্রান্ত	—	বিহ্বল, দিশেহারা, হতজ্ঞান।
খাপছাড়া	—	বেমানান, উদ্ভট, অসংলগ্ন, এলোমেলো।
শ্রাদ্ধ	—	মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির জন্য শ্রদ্ধা নিবেদনের হিন্দু আচার বা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান।
উইল	—	শেষ ইচ্ছেপত্র। মৃত্যুর পরে সম্পত্তি বণ্টন বিষয়ে মালিকের ইচ্ছানুসারে প্রস্তুত ব্যবস্থাপত্র বা দানপত্র, যা তার মৃত্যুর পরে বলবৎ হয়।
প্রেতাত্মা	—	মৃতের আত্মা, ভূত।
অনুতাপ	—	আফসোস, কৃতকর্ম বা আচরণের জন্য অনুশোচনা, পরিতাপ।
তৈলচিত্র	—	তেলরঙে আঁকা ছবি।
প্রণাম	—	হাত ও মাথা দ্বারা গুরুজনের চরণ স্পর্শ করে অভিবাদন।
আত্মগ্লানি	—	নিজের ওপর ক্ষোভ ও ধিক্কার, অনুতাপ, অনুশোচনা।
বিস্ফোরিত	—	বিস্তারিত, প্রসারিত, কম্পিত।
কস্মিনকালে	—	কোনো কালে বা কোনো কালেই।
ছলনা	—	কপটতা, শঠতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ধোঁকা।
হৃৎকম্প	—	হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, বুকের কাঁপুনি।
মটকা	—	রেশমের মোটা কাপড়।
ভর্ৎসনা	—	তিরস্কার, ধমক, নিন্দা।
ইতস্তত	—	দ্বিধা, সংকোচ, গড়িমসি।
অশরীরী	—	দেহহীন, শরীরহীন, নিরাকার।

পাঠের উদ্দেশ্য

ভূতে বিশ্বাস নিয়ে মানুষের মধ্যে যে কুসংস্কার বিরাজমান, তা ভিত্তিহীন, কাল্পনিক ও অন্তঃসারশূন্য। বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে এই কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস সহজেই দূর করা সম্ভব। গল্পটি পড়ে শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে ভয়মুক্ত, কুসংস্কারমুক্ত ও সচেতন হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'তৈলচিত্রের ভূত' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি কিশোর-উপযোগী ছোটগল্প। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'মৌচাক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এ গল্পটি। ভূতে বিশ্বাস নিয়ে মানুষের মধ্যে বিরাজমান কুসংস্কার যে ভিত্তিহীন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ গল্পে তা তুলে ধরেছেন। এ গল্পে তিনি দেখিয়েছেন বিজ্ঞানবুদ্ধির জয়। কুসংস্কারাচ্ছন্নতার কারণে মানুষ নানা অশরীরী শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষকে যদি বিজ্ঞানচেতনা দিয়ে ঘটনা-বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলে ঐসব বিশ্বাসের অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ গল্পে নগেন চরিত্রের মধ্যে ভূত-বিশ্বাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যদিকে পরাশর ডাক্তার বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলেছেন নগেনের বিশ্বাস ও কুসংস্কারের ভিত্তিহীনতাকে। মৃত ব্যক্তির আত্মা ভূতে পরিণত হয়— এরকম বিশ্বাস সমাজে প্রচলিত থাকায় নগেন বৈদ্যুতিক শককে ভূতের কাজ বলে সহজে বিশ্বাস করেছে। অন্যদিকে পরাশর ডাক্তার সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করেন বলে তার কাছে বৈদ্যুতিক শকের বিষয়টি সহজেই ধরা পড়েছে।

লেখক-পরিচিতি

বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের লেখক হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ্যাতিমান। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সাঁওতাল পরগণার দুমকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বিক্রমপুরের মালবদিয়া গ্রামে। 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ', 'সমুদ্রের স্বাদ', 'টিকটিকি', 'হলুদ পোড়া', 'হারানের নাতজামাই' প্রভৃতি ছোটগল্পের জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। মানুষের মন বিশ্লেষণের দিকেই ছিল তাঁর ঝোঁক। তিনি শ্রমিক-কৃষকের কল্যাণের কথাও ভেবেছেন। শোষণ থেকে তাদের মুক্তির জয়গান গেয়েছেন গল্প-উপন্যাসে। তিনি 'মাঝির ছেলে' নামে একটি কিশোর-উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর কিশোর-উপযোগী গল্পের সংখ্যা ২৭। এর মধ্যে 'কোথায় গেল'? 'জব্দ করার প্রতিযোগিতা', 'তিনটি সাহসী ভীরুর গল্প', 'ভয় দেখানোর গল্প', 'সনাতনী', 'দাড়ির গল্প', 'সূর্যবাবুর ভিটামিন সমস্যা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল দারিদ্র্য। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. ৪০০ শব্দের মধ্যে মজা পাওয়ার মতো একটি ভূতের গল্প লেখ (একক কাজ)।

খ. আমাদের সমাজে ভূত ছাড়াও অন্য কী কী কুসংস্কার আছে–সেগুলোর তালিকা করে টীকা লেখ (একক কাজ)। (যাত্রার সময় হাঁচি, যাত্রার সময় পেছন থেকে ডাকা, এক শালিক দেখা, খালি কলম দেখা, কাক ডাকা ইত্যাদি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি উপস্থাপন)

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নগেন কার বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করত?

ক. মাসির খ. পিসির

গ. মামার ঘ. দাদার

২. নগেনের সাথে পরাশর ডাক্তারের প্রথম দেখা হয় কখন?

ক. ২ মাস আগে খ. ৩ মাস আগে

গ. ৪ মাস আগে ঘ. ৫ মাস আগে

৩. মৃত মামার ছবি নগেনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল কেন?

ক. জীবিত মামার প্রতি নগেনের ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল না

খ. মামার মৃত্যুর আগেই ছবিটি আঁকা হয়েছিল

গ. ছবির রূপার ফ্রেমে বৈদ্যুতিক সংযোগ ছিল

ঘ. নগেন ভূতকে খুব ভয় পেত

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আদনান সন্ধ্যাবেলা হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরছিল। এক সময় মনে হলো তার পেছনে পেছনে কেউ হাঁটছে। সে পেছনে ফিরে তাকায় কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না। ফলে সে ভয়ে কাঁপছিল। এমন সময় বিদ্যুৎ চলে গেলে সে জোরে চিৎকার দিয়ে ওঠে। তার মা বাতি নিয়ে ছুটে এসে দেখেন আদনানের পায়ের জুতার তলে পেরেক গাঁথা একটা কাঠি। এতক্ষণে আদনান ভয়ের কারণ খুঁজে পায়।

৪. উদ্দীপকের আদনান-এর সাথে 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনের সাদৃশ্যের কারণ—

ক. তাদের বয়স কম
খ. তারা অন্ধকারকে ভয় করত
গ. তারা ভীষণ ভিতু ছিল
ঘ. তারা ভূত দেখেছিল

৫. এরূপ সাদৃশ্যের মূলে কোনটি বিদ্যমান?

ক. বাস্তবজ্ঞানের অভাব
খ. প্রকৃত শিক্ষা না পাওয়া
গ. মানসিক বিকাশ না হওয়া
ঘ. সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারা

সৃজনশীল প্রশ্ন

রফিক সাহেব শীতের ছুটিতে ভাগ্নি সাহানাকে নিয়ে গ্রামে বেড়াতে যান। রাতের আকাশ দেখার জন্য তারা খোলা মাঠে যান। অদূরেই দেখতে পান মাঠের মধ্যে হঠাৎ এক প্রকার আলো জ্বলে উঠে তা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। ওটা কিসের আলো তা জানতে চাইলে সাহানার মামা বলেন, ভূতের! সাহানা ভয় পেয়ে তার মামাকে জড়িয়ে ধরে। মামা তখন তাকে বুঝিয়ে বলেন যে, খোলা মাঠের মাটিতে এক প্রকার গ্যাস থাকে– যা বাতাসের সংস্পর্শে এলে জ্বলে ওঠে। সাহানা বিষয়টা বুঝতে পেরে স্বাভাবিক হয়।

ক. 'তৈলচিত্রের ভূত' কোন জাতীয় রচনা ?
খ. নগেনকে ভর্ৎসনা করলেন কেন ?
গ. উদ্দীপকের সাহানা আর 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনের বিশেষ মিল কোথায় ?—ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "রফিক সাহেব আর 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের পরাশর ডাক্তার উভয়কে আধুনিক মানসিকতার অধিকারী বলা যায়?" —উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম

শেখ মুজিবুর রহমান

[পূর্বকথা : ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের সামরিক একনায়ক আইয়ুব খান ক্ষমতাচ্যুত হন। এরপর ক্ষমতায় এসে নতুন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। গণতন্ত্রের ধারা অনুসারে পাকিস্তানের শাসনভার পাওয়ার কথা আওয়ামী লীগের অর্থাৎ বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ও গণতন্ত্র হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১-এর ৩রা মার্চ ঢাকায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ডেকেছিলেন। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই তিনি হঠাৎ ১লা মার্চ এক ঘোষণায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। এই ষড়যন্ত্রমূলক ঘোষণা শুনেই পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের ঝড় ওঠে। 'জয় বাংলা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো' ইত্যাদি স্লোগানে শহর–বন্দর–গ্রাম আন্দোলিত হয়।

এই পটভূমিতেই ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) প্রায় ১০ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ১৮ মিনিটের ওই ভাষণে তিনি বাঙালির মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান জানান। আবেগে, বক্তব্যে, দিক-নির্দেশনায় ওই ভাষণটি ছিল অনবদ্য। বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণটিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ঐতিহাসিক গেটিসবার্গ ভাষণের সঙ্গে তুলনা করা হয়। ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো এই ভাষণটিকে ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব্ দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করে। ঐতিহাসিক ভাষণটি এখানে লিপিবদ্ধ হলো।]

ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়,

২০১৬

বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল-ল' জারী করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনে ৭ জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন-গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি।

আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসব। আমি বললাম অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব— এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরও আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম—আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে, যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাব। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কী পেলাম আমরা? আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে—তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু—আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সাথে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপর, আমার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কীসের রাউন্ড টেবিল, কার সাথে বসবো? যারা আমার মানুষের

বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সাথে বসবো? হঠাৎ আমার সাথে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার,

২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহিদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন, 'মার্শাল-ল' withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারব কি পারব না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত–ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে—শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা, কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়—তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু—আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো—কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়— হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালী রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেয়ানেয়া চলবে না।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই ২০১৬

নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

(তথ্যসূত্র : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান)

শব্দার্থ ও টীকা

নির্বাচনের পর	—	১৯৭০-এ অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর। ঐ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।
ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি	—	জাতীয় পরিষদ।
শাসনতন্ত্র	—	রাষ্ট্র পরিচালনার অনুশাসন ও বিধানসমূহ, সংবিধান।
ভুট্টো সাহেব	—	পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির তৎকালীন নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো। তিনি পাকিস্তানি সামরিক সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাঙালি যেন পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় যেতে না পারে সে জন্যে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।
আরটিসি	—	রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স। গোল টেবিল বৈঠক। সমস্যা সমাধানের কথা বলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রকাশ্যে গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করলেও ভেতরে ভেতরে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিতে থাকেন।
মার্শাল-ল	—	সামরিক আইন। পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়া নস্যাৎ করার জন্য ১৯৫৮ সাল থেকে সামরিক শাসন চালু রাখা হয়।
withdraw	—	প্রত্যাহার।
ব্যারাক	—	সেনাছাউনি।
সেক্রেটারিয়েট	—	রাষ্ট্র পরিচালনার প্রশাসনিক কেন্দ্র। সচিবালয়।
সুপ্রিমকোর্ট	—	সর্বোচ্চ আদালত।
হাইকোর্ট	—	উচ্চ আদালত।
জজকোর্ট	—	জেলা আদালত।
সেমি-গভর্নমেন্ট	—	আধা-সরকারি।
ওয়াপদা		ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
UNESCO	—	জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা। এর সদর দপ্তর ফ্রান্সের প্যারিসে।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থী রচনাটি পাঠ করলে স্বাধীন বাঙালি জাতি ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রাম, অবদান এবং বাঙালি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সাধনার কথা জানতে পারবে এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে।

পাঠ-পরিচিতি

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙে বাঙালির সার্বিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে কারাবরণ করেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অর্জন করে নিরঙ্কুশ বিজয়। তবুও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয়। ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়

৭ই মার্চ ১৯৭১-এ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) প্রায় দশ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৮ মিনিটের ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ইউনেস্কো এই ভাষণটিকে 'বিশ্ব প্রামান্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। যা বাংলাদেশের জন্য গৌরবের। এই ভাষণ ৭ই মার্চের ভাষণ হিসেবে বিখ্যাত।

লেখক-পরিচিতি

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি ও বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি আমাদের জাতির পিতা। তাঁর জন্ম ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায়। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মাতার নাম সায়েরা খাতুন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতি ও দেশব্রতে যুক্ত হন। ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি বহুবার কারাবরণ করেছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনায় তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি ৬ দফা আন্দোলনের মুখ্য প্রবক্তা। শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনাকালে ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ মধ্যরাতের পরে পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালির এই অবিসংবাদিত নেতাকে তাঁর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের আগে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

মুক্তিযুদ্ধকালে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে গঠিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধ পরিচালনা করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি তিনি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফেরেন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার মহান দায়িত্বে ব্রতী হন। তাঁর সরকারই স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করে (১৯৭২)। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে তিনি প্রথম বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়ে বাংলাকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সামরিক বাহিনীর কতিপয় বিপথগামী সদস্যের হাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. বাঙালিদের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন কোন আন্দোলনে কী জাতীয় ভূমিকা রেখেছেন, সে সম্পর্কে একটি রচনা লেখ (একক কাজ)।

খ. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শৈশব, কৈশোর, যৌবন, ব্যক্তিগত জীবন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দেশপ্রেম ইত্যাদি অবলম্বনে ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটিকা, ছবি ইত্যাদি রচনা করে দেয়ালিকা প্রকাশ কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর কাজ)।

গ. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান—এ বিষয় অবলম্বনে পোস্টার প্রতিযোগিতার আয়োজন কর (একক কাজ, প্রত্যেকের পোস্টারে শ্রেণি ও শিক্ষার্থীর নাম ও রোল নম্বর লিখতে হবে)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কত তারিখে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন ?

ক. ১৯৬৯-এর ৭ই মার্চ   খ. ১৯৭১-এর ৩রা মার্চ

গ. ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ   ঘ. ১৯৭৪-এর ৩রা মার্চ

২. রেসকোর্স ময়দানের ভাষণই বাংলাদেশের স্বাধীনতার আহ্বান। কেননা এই ভাষণ—

ক. আজও স্বাধীনতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়

খ. সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলার অঙ্গীকার

গ. অ্যাসেম্বলিতে না বসার আহ্বান

ঘ. বাঙালির সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রামের আহ্বান

৩. আইয়ুব খানের পতনের পর কে দেশে গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ?

ক শেখ মুজিবুর রহমান খ. ইয়াহিয়া খান

গ. মওলানা ভাসানী ঘ. জুলফিকার আলী ভুট্টো

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জেল, জুলুম, নির্যাতনের শিকার হন। নির্বাসিত জীবন যাপন করেন। ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী তাঁর জীবন থেকে কেড়ে নেয় ২৭টি বছর। কিন্তু তিনি কখনও মাথা নত করেন নি। অবশেষে জয় হয় মানবতার, অবসান ঘটে বর্ণবাদের।

৪। বঙ্গবন্ধু ও নেলসন ম্যান্ডেলা এর মধ্যে যে গুণের মিল পাওয়া যায় তা হচ্ছে–

i. সহনশীলতা

ii. দেশপ্রেম

iii. আপসহীনতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. বঙ্গাবন্ধুর এই বিশেষ গুণ আমাদের উপহার দিয়েছে—

ক. গভীর দেশপ্রেম খ. বাঙালি সংস্কৃতি

গ. স্বাধীন রাষ্ট্র ঘ. বৈষম্য থেকে মুক্তি

সৃজনশীল প্রশ্ন

অহিংসার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় গণতন্ত্র – যেখানে সবারই সমান স্বাধীনতা থাকে। যেখানে প্রত্যেকেই হবে তার জগৎ-নিয়ন্তা। এটাই সেই গণতন্ত্র যাতে আপনাদের আজ অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানাচ্ছি। একদিন আপনারা বুঝতে পারবেন, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য ভুলে যাওয়া এবং আপনারা আপনাদের শুধু মানুষ মনে করবেন, এবং সবাই একত্র হয়ে স্বাধীনতার আন্দোলনে ব্রতী হবেন।

ক. বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম কত তারিখে ?

খ. 'বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস'–বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?

গ. উদ্দীপকে মহাত্মা গান্ধীর ভাষণে বঙ্গাবন্ধুর ভাষণের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'— ভাষণটির সম্পূর্ণভাব ধারণ করে— মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

খাদ্যশস্যের পরেই বাংলাদেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে যে জিনিসটি অতি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে, তা হলো এখানকার কুটিরশিল্প। এক সময়ে ঘর-গৃহস্থ লিরানিত্য ব্যবহারের প্রায় সব পণ্যই এদেশের গ্রামের কুটিরে তৈরি হতো। আজও অনেক কিছুই হয়। এগুলো কুটিরশিল্পের মাধ্যমে তৈরি হলেও শিল্পগুণ বিচারে এ ধরণের সামগ্রী লোকশিল্পের মধ্যে গণ্য।

আমাদের দেশের বিভিন্ন লোকশিল্পের কতকগুলো এক সময়ে এমন উচ্চমানের ছিল যে, আজও আমরা সেসব জিনিসের কথা স্মরণ করে গর্ববোধ করি।

প্রথমে বলতে হয় ঢাকাই মসলিনের কথা। ঢাকা শহরের অদূরে ডেমরা এলাকার তাঁতিদের এ অমূল্য সৃষ্টি এককালে দুনিয়া জুড়ে তুলেছিল প্রবল আলোড়ন। ঢাকার মসলিন তৎকালীন মোগল বাদশাহদের বিলাসের বস্তু ছিল। মসলিন কাপড় এত সূক্ষ্ম সুতা দিয়ে বোনা হতো যে, ছোট্ট একটি আংটির ভিতর দিয়ে অনায়াসে কয়েকশ গজ মসলিন কাপড় প্রবেশ করিয়ে দেয়া সম্ভব ছিল। শুধু কারিগরি দক্ষতায় নয়, এ ধরনের কাপড় বুনবার জন্য শিল্পীমন থাকাও প্রয়োজন। আজ সেই মসলিন নেই। তবে মসলিন যারা বুনত, তাদের বংশধররা যুগ যুগ ধরে এ শিল্পধারা বহন করে আসছে বলে জামদানি শাড়ি আমরা আজও দেখতে পাই। বর্তমান যুগে জামদানি শাড়ি দেশে-বিদেশে শুধু পরিচিতই নয়, গর্বের বস্তু।

এমনি আর একটি গ্রামীণ লোকশিল্প আজ লুপ্তপ্রায় হলেও কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়। এটি হলো নকশিকাঁথা। এক সময় বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে এ নকশিকাঁথা তৈরির রেওয়াজ ছিল। এক একটি সাধারণ আকারের নকশিকাঁথা সেলাই করতেও কমপক্ষে ছয় মাস লাগত। বর্ষাকালে যখন চারদিকে পানি থৈ থৈ করে, ঘর থেকে বাইরে বের হওয়া যায় না, এমন মৌসুমই ছিল নকশিকাঁথা সেলাইয়ের উপযুক্ত সময়। মেয়েরা সংসারের কাজ সাঙ্গ করে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে পাটি বিছিয়ে পানের বাটাটি পাশে নিয়ে পা মেলে বসতেন এ বিচিত্র নকশা তোলা কাঁথা সেলাই করতে। পড়শিরাও সুযোগ পেলে আসত গল্প করতে। আপন পরিবেশ থেকেই মেয়েরা তাঁদের মনের মতো করে কাঁথা সেলাইয়ের অনুপ্রেরণা পেতেন। এমনি এক একটি কাঁথা সেলাই কত গল্প, কত হাসি, কত কান্নার মধ্যে দিয়ে শেষ হতো তা বলা যায় না। শুধু কতকগুলো সূক্ষ্ম সেলাই আর রং-বেরঙের নকশার জন্যই নকশিকাঁথা বলা হয় না বরং কাঁথার প্রতিটি সুচের ফোঁড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক-একটি পরিবারের কাহিনী, তাদের পরিবেশ, তাদের জীবনগাথা।

আমাদের দেশের লোকশিল্প বিভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁতশিল্প বাংলাদেশের সব এলাকাতেই আছে; তবে ঢাকা, টাঙ্গাইল, শাহজাদপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এলাকায় তাঁতশিল্পের মৌলিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

জামদানি শাড়ির কথা আমরা আলোচনা করেছি। নারায়ণগঞ্জ জেলার নওয়াপাড়া গ্রামেই জামদানি কারিগরদের বসবাস। শতাব্দীকাল ধরে এ তাঁতশিল্প বিস্তার লাভ করেছে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী এ এলাকায়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ শীতলক্ষ্যা নদীর পানির বাষ্প থেকে যে আর্দ্রতার সৃষ্টি হয় তা জামদানি বোনার জন্য শুধু উপযোগীই নয়, বরং এক অপরিহার্য বস্তু বলা চলে। ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া এবং পরিস্থিতির জন্য শুধু অতীতের তাঁতিদের তাঁতশিল্পই নয়, বর্তমানের বড় বড় কাপড়ের কারখানাও শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে।

কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে প্রস্তুত খাদি বা খদ্দরের সমাদর শুধু গ্রামজীবনেই নয়, শহরের আধুনিক সমাজেও যথেষ্ট রয়েছে। খাদি কাপড়ের বিশেষত্ব হচ্ছে, এর সবটাই হাতে প্রস্তুত। তুলা থেকে হাতে সুতা কাটা হয়। গ্রামবাসীরা অবসর সময়ে সুতা কাটে। এদের বলা হয় কাটুনি। গ্রামে বাড়ির আশেপাশে তুলার গাছ লাগানোর রীতি আছে। সেই গাছের তুলা দিয়ে সুতা কাটা ও হস্ত চালিত তাঁতে এসব সুতায় যে কাপড় প্রস্তুত করা হয়, সেই কাপড়ই প্রকৃত খাদি বা খদ্দর। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে বিদেশি কাপড় বর্জন করে দেশি কাপড় ব্যবহারের যে আদর্শ প্রবর্তিত হয়েছিল তারই সাফল্যের স্বাক্ষর এই খাদি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, বান্দরবান, রামগড় এলাকার চাকমা, কুকি ও মুরং মেয়েরা এবং সিলেটের মাছিমপুর অঞ্চলের মণিপুরী মেয়েরা তাদের নিজেদের ও পুরুষদের পরিধেয় বস্ত্র বুনে থাকে। এ কাপড়গুলো সাধারণত মোটা ও টেকসই হয়। নকশা, রং ও বুননকৌশল সবই তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী হয়।

বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে কাঁসা ও পিতলের বাসনপত্র এককালে বেশ প্রচলিত ছিল। আজও শত শত গ্রাম্য কারিগর তৈরি করে বিচিত্র ধরনের তৈজসপত্র। প্রথমে মাটির ছাঁচ করে তার মধ্যে ঢেলে দেয় গলিত কাঁসা। ধীরে ধীরে এ গলিত ধাতু ঠাণ্ডা হয়ে আসে। তখন ওপর থেকে মাটির ছাঁচটি ভেঙে ফেললেই ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে বদনা, বাটি, গ্লাস, থালা ইত্যাদি। তারপর এগুলো পালিশ করা হয়। এ ধরনের বাসনে নানারকম ফুল পাতার নকশা বা ফরমাশকারীর নাম খোদাই করা থাকে। এমনকি আজকাল অতি আধুনিক গৃহসজ্জার সামগ্রী হিসেবে তামা-পিতলের ঘড়া, থালা, ফুলদানি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

পোড়ামাটির কাজের ঐতিহ্য এদেশে বহু যুগের। মাটির কলস, হাঁড়ি, পাতিল, সানকি, ফুলদানি, দইয়ের ভাঁড়, রসের

২০১৫

ঠিলা, সন্দেশ ও পিঠার ছাঁচ, টেপা পুতুল, হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী ইত্যাদির মূর্তি গড়বার কাজে বাংলাদেশের পালপাড়া ও কুমোরপাড়ার অধিবাসীরা সারা বছরই ব্যস্ত থাকে। আধুনিক রুচির ফুলদানি, ছাইদানি, চায়ের সেট, কৌটা, বাক্স বা ঘর সাজাবার নানা ধরনের শৌখিন সামগ্রী সব কিছুই মাটি দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। এ ছাড়া পুরাকালের মসজিদ বা মন্দিরের গায়ে যেসব নকশাদার ইট দেখা যায় তা এদেশের লোকশিল্পের এক অতুলনীয় নিদর্শন।

প্রতীকধর্মী মাটির টেপা পুতুলগুলোর মধ্যে শত শত বছর পূর্বের পাল বা কুমোরদের যে কারিগরিবিদ্যা এবং শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়, তা অভাবনীয়।

কাঠের কাজের খুব বেশি শিল্পগুণ আজকাল দেখা না গেলেও অতীতের কিছু কিছু নমুনা যা দেখতে পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান করা যায় যে, এ দেশে এক সময় গৃহনির্মাণের কাজে কারুকার্যে ভূষিত কাঠের ব্যবহার ছিল। বিশেষ করে পুরাতন খাট-পালঙ্ক, খুঁটি-দরজা ইত্যাদির নমুনা আজও দেখা যায়। এ ধরনের কাজকে বলা হয় হাসিয়া। বরিশালের কাঠের নৌকার কাজও বেশ নিপুণতার দাবি রাখে।

খুলনার মাদুর এবং সিলেটের শীতলপাটি সকলের কাছে পরিচিত। গ্রীষ্মকালে ব্যবহারে আরামদায়ক বলেই নয়, শীতলপাটির নকশা একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। অতীতে শীতলপাটির বহু দক্ষ কারিগর ছিল। এ শিল্পীদের দিয়ে এককালে ঢাকার নবাব পরিবার হাতির দাঁতের শীতলপাটি তৈরি করিয়েছিলেন। ঢাকার জাদুঘরে তা সংরক্ষিত আছে। এটি আমাদের লোকশিল্পের এক অতুলনীয় নিদর্শন।

আমাদের গ্রামের ঘরে ঘরে যে শিকা, হাতপাখা, ফুলপিঠা তৈরি করা হয়, তা মোটেই অবহেলার জিনিস নয়। এদের বিচিত্র নকশা, রং এবং কারিগরি সৌন্দর্যের যে নিদর্শন চোখে পড়ে তা শুধু আমাদের অতি আপন বস্তুই নয়, সৌন্দর্যের দিক দিয়েও এদের স্থান বহু উচ্চে। সাধারণ সামগ্রী হলেও যাঁরা এগুলো তৈরি করেন তাঁদের সৌন্দর্যপ্রিয়তার প্রকাশ ঘটে এসব জিনিসের মধ্য দিয়ে। শিকা গৃহস্থালির জিনিসপত্তর ঝুলিয়ে রাখার জন্য তৈরি, একথা সকলেই জানে। শুধু শুধু প্রয়োজন মিটলেই মন ভরে না বলে সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষ নানা নকশা জুড়ে দিয়ে তাকেও একটি বিশেষ শিল্পবস্তুতে পরিণত করেছে।

আমাদের দেশে বাঁশ অপ্রতুল নয়। বাঁশের নানারকম ব্যবহার ছাড়া আমাদের চলতেই পারে না। ছোটখাটো সামান্য হাতিয়ারের সাহায্যে আমাদের কারিগররা বাঁশ দিয়ে আজকাল আধুনিক রুচির নানা ব্যবহারিক সামগ্রী তৈরি করছে যা শুধু আমাদের নিজেদের দেশেই নয়, বিদেশেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ছাড়া সোলাশিল্পের উৎকৃষ্ট সৃজনশীল নমুনাও দেখা যায় পুতুল, টোপর ইত্যাদির মধ্যে।

কাপড়ের পুতুল তৈরি করা আমাদের দেশের মেয়েদের একটি সহজাত শিল্পগুণ। অনেকাংশে এসব পুতুল প্রতীকধর্মী। অবশ্য আজকাল বাস্তবধর্মী কাপড়ের পুতুল তৈরিও শুরু হয়েছে। এগুলো যেমন আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে, তেমনি বিদেশি পয়সাও উপার্জন করে।

লোকশিল্প সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব আমাদের সকলের। বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর, শহরতলি এবং গ্রামের হাজার হাজার নারী-পুরুষ আছে, যারা কাজ করতে চায় অথচ কাজের অভাবে দিন দিন দারিদ্র্যের শিকার হচ্ছে। সুপরিকল্পিত উপায়ে এবং সুরুচিপূর্ণ লোকশিল্প প্রস্তুতির দিকে মনোযোগ দিলে তাদের সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে।

আমাদের সকলকেই আজ আপন পরিবেশ এবং পরিস্থিতির দিকে শুধু চোখ দিয়ে তাকালে হবে না, হৃদয় দিয়েও তাকাতে হবে। লোকশিল্পের ভিতর দিয়ে হৃদয়-মনের প্রকাশ হলে তা বিদেশিদের হৃদয়ে সাড়া জাগাবে। এভাবে দেশে দেশে হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজেও আমাদের লোকশিল্প সাহায্য করতে পারে।

শব্দার্থ ও টীকা

নিবিড় — ঘনিষ্ঠ।

পণ্য — বিক্রি করা যায় এমন জিনিস।

লোকশিল্প — দেশি জিনিস দিয়ে দেশের মানুষের হাতে তৈরি শিল্পসম্মত দ্রব্য।

অমূল্য — মূল্য দিয়ে যার বিচার করা যায় না।

অপ্রতুল — যথেষ্ট নয়।

দক্ষতা — নিপুণতা, কুশলতা।

লুপ্তপ্রায় — লোপ পেতে বসেছে এমন।

রেওয়াজ — রীতি, পদ্ধতি, ধরন।

অনুপ্রেরণা — উদ্দীপনা, উৎসাহ।

জীবনকথা — জীবনের কাহিনী।

অপরিহার্য — যা এড়ানো যায় না, আবশ্যিক।

মণিপুরী — মণিপুর-সম্পর্কিত, মণিপুরে উৎপন্ন।

প্রতীকধর্মী — নিদর্শনজ্ঞাপন, সংকেত।

টোপর — হিন্দু সম্প্রদায়ের বরের মাথার মুকুট।

টেকসই — মজবুত।

ঐতিহ্য — অতীতের গর্ব ও গৌরবের বস্তু।

সংরক্ষণ — বিশেষভাবে রক্ষা করা।

সম্প্রসারণ — প্রসারিত করা, বিস্তার করা।

পাঠের উদ্দেশ্য

এই প্রবন্ধটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকশিল্প ও লোক-ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারবে। তারা দেশের লোকশিল্প সম্পর্কে আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হবে এবং তা সংরক্ষণে তৎপর হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধটি 'আমাদের লোককৃষ্টি' গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। লেখক এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের লোকশিল্প ও লোক-ঐতিহ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। এ বর্ণনায় লোকশিল্পের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধের পরিচয় রয়েছে। আমাদের নিত্যব্যবহার্য অধিকাংশ জিনিসই এ কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভরশীল। শিল্পগুণ বিচারে এ ধরনের শিল্পকে লোকশিল্পের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে।

পূর্বে আমাদের দেশে যে সমস্ত লোকশিল্পের দ্রব্য তৈরি হতো তার অনেকগুলোই অত্যন্ত উচ্চমানের ছিল। ঢাকাই মসলিন তার অন্যতম। ঢাকাই মসলিন অধুনা বিলুপ্ত হলেও ঢাকাই জামদানি শাড়ি অনেকাংশে সে স্থান অধিকার করেছে। বর্তমানে জামদানি শাড়ি দেশে-বিদেশে পরিচিত এবং আমাদের গর্বের বস্তু।

নকশি কাঁথা আমাদের একটি গ্রামীণ লোকশিল্প। এ শিল্প আজ লুপ্তপ্রায় হলেও এর কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়। আপন পরিবেশ থেকেই মেয়েরা তাঁদের মনের মতো করে কাঁথা সেলাইয়ের অনুপ্রেরণা পেতেন। কাঁথার প্রতিটি সুচের ফোঁড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক-একটি পরিবারের কাহিনী, তাদের পরিবেশ, তাদের জীবনগাথা। আমাদের দেশের কুমোরপাড়ার শিল্পীরা বিভিন্ন ধরনের তৈজসপত্র ছাড়াও পোড়ামাটি দিয়ে নানা প্রকার শৌখিন দ্রব্য তৈরি করে থাকে। নানা প্রকার পুতুল, মূর্তি ও আধুনিক রুচির ফুলদানি, ছাইদানি, চায়ের সেট ইত্যাদি তারা গড়ে থাকে। খুলনার মাদুর ও সিলেটের শীতলপাটি সকলের কাছে পরিচিত।

আমাদের দেশের এই যে লোকশিল্প তা সংরক্ষণের দায়িত্ব আমাদের সকলের। লোকশিল্পের মাধ্যমে আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে পারি।

লেখক-পরিচিতি

কামরুল হাসান ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। একজন খ্যাতিমান শিল্পী হিসেবে দেশে-বিদেশে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর আঁকা ছবিতে এদেশের লোকজ জীবনের নানা উপাদান আমাদের ঐতিহ্য-সচেতন করে। লোকশিল্প সংরক্ষণেও তাঁর প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয় । কর্মজীবনে তিনি দীর্ঘকাল ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পরে তিনি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ডিজাইন সেন্টারের প্রধান (নকশাবিদ) নিযুক্ত হন। এ সময় তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকশিল্পের নানা উপকরণ সংগ্রহ করেন। ছবি আঁকার বিচিত্র কলাকৌশল এবং লোকশিল্পের নানা দিক সম্পর্কে তাঁর লেখা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর একটি বইয়ের নাম 'বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা'। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে কামরুল হাসান ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার এলাকায় তোমার দেখা কয়েকটি লোকশিল্পের পরিচয় তুলে ধর (একক কাজ)।

খ. তোমার দেখা কোনো লোকশিল্প মেলার বিবরণ দিয়ে একটি রচনা লেখ (একক কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি মোগল বাদশাহদের বিলাসের বস্তু ছিল ?

ক. নকশি কাঁথা খ. ঢাকাই মসলিন

গ. খদ্দরের কাপড় ঘ. শীতলপাটি

২০১৬

২. মসলিনের কারিগরদের বংশধরেরা আজও কোথায় বসবাস করছে?

ক. কুমিল্লা খ. সিলেট

গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘ. নারায়ণগঞ্জ

৩. গ্রামীণ নারীদের আবেগের সাথে সর্বাধিক সম্পৃক্ত লোকশিল্পটি হচ্ছে

ক. নকশি কাঁথা খ. শীতল পাটি

গ. কাপড়ের পুতুল ঘ. জামদানি শাড়ি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কামাল স্থানীয় কারিগর দ্বারা একটি পিতলের কলস তৈরি করাল। বন্ধুর বিয়েতে কলসটি উপহার দিলে কেউ কেউ উপহাস করল; আবার প্রশংসাও পেল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বললেন, স্থানীয় কারিগরদের এরূপ লোকশিল্প নিয়ে আমাদের গর্ব করা উচিত।

৪. কামালের দেওয়া উপহারটিকে শিল্পগুণ বিচারে কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা যায়?

ক. আধুনিক শিল্প খ. কুটির শিল্প

গ. চারু শিল্প ঘ. মৃৎ শিল্প

৫. এরূপ উপহার দেওয়ার পিছনে কামালের উদ্দেশ্যকে 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধের আলোকে বলা যায়–

i. অর্থ সাশ্রয় করা

ii. লোকশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা

iii. ঐতিহ্যকে ধরে রাখা

কোনটি সঠিক উত্তর?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. দাড়িয়াপুর গ্রামের রহিমা দরিদ্র হলেও শিল্পী মনের অধিকারিনী। ছোটবেলা থেকেই সে বাঁশ ও বেত দিয়ে সংসারে প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস তৈরি করত। কিন্তু আচমকা একদিন তার স্বামী মারা গেলে দুই সন্তান নিয়ে সে পথে বসে। রহিমা উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে সুঁই-সুতা হাতে তুলে নেয়। সে তার সুখ-দুঃখের জীবনালেখ্য দীঘল সুতার টানে ভাষা দিতে থাকে। একদিন বেসরকারি একটি সংস্থার মাধ্যমে তার সুচিশিল্পগুলো বিদেশে যায় এবং মোটা অঙ্কের অর্থপ্রাপ্তির পাশাপাশি সে প্রচুর সুনাম অর্জন করে।

ক. কোন এলাকার 'মাদুর' সকলের কাছে পরিচিত ?

খ. 'ঢাকাই মসলিনের কদর ছিল দুনিয়া জুড়ে'—বলতে কী বোঝায় ?

গ. স্বামীর মৃত্যুর পর রহিমার কাজটি 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধে কীসের প্রতিনিধিত্ব করে? বর্ণনা কর।

ঘ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রহিমার অবদান 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২. সেঁজুতির স্কুলে বার্ষিক লোকশিল্প মেলা চলছিল। সে মেলায় মাটির তৈরি একাধিক পুতুল জমা দেয়। সেগুলো একটি গ্রামীণ পরিবারকে প্রতিনিধিত্ব করে। দর্শনার্থী, বিচারক এবং প্রতিযোগী সবাই মুগ্ধ হয়ে দেখেন এটি। একজন মন্তব্য লেখেন, আমাদের লোকশিল্প যে সমৃদ্ধ তা বলে শেষ করার মতো নয়। কিন্তু সময় ও রুচির পরিবর্তনে তা আজ প্রায় ধ্বংসোন্মুখ। আমাদের সকলের এখনই এর প্রতি নজর দেওয়া উচিত। নইলে অচিরেই এ শিল্প ধারাকে আমরা হারাব।

ক. শিল্পগুণ বিচারে আমাদের কুটিরশিল্প কোন শিল্পের মধ্যে পড়ে?

খ. বর্ষাকালে নকশি কাঁথা তৈরির জন্য উপযুক্ত সময় কেন ?

গ. সেঁজুতির উদ্যোগ আমাদের লোকশিল্পের কোন কারিগরের শিল্পকে প্রতিনিধিত্ব করে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে লোকশিল্প বাঁচিয়ে রাখার যে তাগিদ অনুভূত হয়েছে তা 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধের লেখকের বক্তব্যকে সমর্থন করে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

সুখী মানুষ

মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ

চরিত্র-পরিচিতি

নাম	**বয়স**
মোড়ল	৫০
কবিরাজ	৬০
হাসু	৪৫
রহমত	২০
লোক	৪০

(প্রথম দৃশ্য)

[মোড়লের অসুখ। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে। কবিরাজ মোড়লের নাড়ি পরীক্ষা করছে। মোড়লের আত্মীয় হাসু মিয়া আর মোড়লের বিশ্বাসী চাকর রহমত আলী অসুখ নিয়ে কথা বলছে।]

হাসু : রহমত, ও রহমত আলী।

রহমত : শুনছি।

হাসু : ভালো করে শোনো, ঐ কবিরাজ যতই নাড়ি দেখুক, তোমার মোড়লের নিস্তার নাই।

রহমত : অমন ভয় দেখাবেন না। তাহলে আমি হাউমাউ করে কাঁদতে লেগে যাব।

হাসু : কাঁদ, মন উজাড় করে কাঁদ। তোমার মোড়ল একটা কঠিন লোক। আমাদের সুবর্ণপুরের মানুষকে বড় জ্বালিয়েছে। এর গরু কেড়ে, তার ধান লুট করে তোমার মোড়ল আজ ধনী। মানুষের কান্না দেখলে হাসে।

রহমত : তাই বলে মোড়লের ব্যারাম ভালো হবে না কেন?

হাসু : হবেই না তো। মোড়ল যে অত্যাচারী, পাপী। মনের মধ্যে অশান্তি থাকলে ওষুধে কাজ হয় না। দেখে নিও, মোড়ল মরবে।

রহমত : আর আজে–বাজে কথা বলবেন না। আপনি বাড়ি যান!

কবিরাজ : এত কোলাহল করো না। আমি রোগীর নাড়ি পরীক্ষা করছি।

রহমত : ও কবিরাজ, নাড়ি কী বলছে! মোড়ল বাঁচবে তো!

কবিরাজ : মূর্খের মতো কথা বল না। মানুষ এবং প্রাণী অমর নয়। আমি যা বলি মনোযোগ দিয়ে তাই শ্রবণ কর।

হাসু : আমাকে বলুন। মোড়ল আমার মামাতো ভাই।

রহমত : মোড়ল আমার মনিব।

কবিরাজ : এই নিষ্ঠুর মোড়লকে যদি বাঁচাতে চাও, তাহলে একটি কঠিন কর্ম করতে হবে।

হাসু : বাঘের চোখ আনতে হবে?

কবিরাজ : আরও কঠিন কাজ।

রহমত : হিমালয় পাহাড় তুলে আনব?

কবিরাজ : পাহাড়, সমুদ্র, চন্দ্র, নক্ষত্র কিছুই আনতে হবে না।

মোড়ল : আর সহ্য করতে পারছি না। জ্বলে গেল। হাড় ভেঙে গেল। আমাকে বাঁচাও।

কবিরাজ : শান্ত হও। ও রহমত, মোড়লের মুখে শরবত ঢেলে দাও।

(রহমত মোড়লকে শরবত দিচ্ছে।)

হাসু : ঐ মোড়ল জোর করে আমার মুরগি জবাই করে খেয়েছে। আমি আজ মুরগির দাম নিয়ে ছাড়ব।

মোড়ল : ভাই হাসু এদিকে এস, আমি সব দিয়ে দেব। আমাকে শান্তি এনে দাও।

কবিরাজ : মোড়ল, তুমি কী আর কোনো দিন মিথ্যা কথা বলবে?

মোড়ল : আর বলব না। এই তোমার মাথায় হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করছি, আর কোনোদিন মানুষের ওপর জবরদস্তি করব না। আমাকে ভালো করে দাও।

কবিরাজ : লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আর কোনোদিন লোভ করবে?

মোড়ল : না। লোভ করব না, অত্যাচার করব না। আমাকে শান্তি দাও। সুখ দাও।

কবিরাজ : তাহলে মনের সুখে শুয়ে থাক, আমি ওষুধের কথা চিন্তা করি।

মোড়ল : সুখ কোথায় পাব? আমাকে সুখ এনে দাও।

হাসু : অন্যের মনে দুঃখ দিলে কোনোদিন সুখ পাবে না।

২০১৬

মোড়ল : আমার কত টাকা, কত বড় বাড়ি! আমার মনে দুঃখ কেন?

কবিরাজ : চুপ কর। যত কোলাহল করবে তত দুঃখ বাড়বে। হাসু এদিকে এস, আমার কথা শ্রবণ কর। মোড়লের ব্যামো ভালো হতে পারে, যদি...

রহমত : যদি কী?

কবিরাজ : যদি আজ রাত্রির মধ্যেই—

হাসু : কী করতে হবে?

কবিরাজ : যদি একটি ফতুয়া সংগ্রহ করতে পার।

রহমত : ফতুয়া?

কবিরাজ : হ্যাঁ, জামা। এই জামা হবে একজন সুখী মানুষের। তার জামাটা মোড়লের গায়ে দিলে, তৎক্ষণাৎ তার হাড় মড়মড় রোগ ভালো হবে।

রহমত : এ তো খুব সোজা ওষুধ।

কবিরাজ : সোজা নয়, খুব কঠিন কাজ। যাও, সুখী মানুষকে খুঁজে দেখ। সুখী মানুষের জামা না হলে অসুখী মোড়ল বাঁচবে না।

মোড়ল : আমি বাঁচব। জামা এনে দাও, হাজার টাকা বখশিশ দেব।

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

[বনের ধারে অন্ধকার রাত। চাঁদের ম্লান আলো। ছোট একটি কুঁড়েঘরের সামনে হাসু মিয়া ও রহমত গালে হাত দিয়ে ভাবছে।]

রহমত : কী তাজ্জব কথা, পাঁচ গ্রামে একজনও সুখী মানুষ পেলাম না। যাকেই ধরি, সেই বলে, না ভাই, আমি সুখী নই।

হাসু : আর তো সময় নাই ভাই, এখন বারটা। সুখী মানুষ নাই, সুখী মানুষের জামাও নাই। মোড়ল তো তাহলে এবার মরবে।

রহমত : আহা রে, আমরা এখন কী করব! কোথায় একটা মানুষ পাব, যে কিনা—

হাসু : পাওয়া যাবে না। সুখী মানুষ পাওয়া যাবে না। সুখ বড় কঠিন জিনিস। এ দুনিয়াতে ধনী বলছে, আরও ধন দাও; ভিখারি বলছে, আরও ভিক্ষা দাও; পেটুক বলছে, আরও খাবার দাও। শুধু দাও আর দাও। সবাই অসুখী। কারও সুখ নেই।

রহমত : আমরাও বলছি, মোড়লের জন্য জামা দাও, আমাদের বখশিশ দাও। আমরাও অসুখী।

হাসু : চুপ চুপ! ঘরের মধ্যে কে যেন কথা বলছে।

রহমত : ভূত নাকি? চলেন, পালিয়ে যাই। ধরতে পারলে মাছভাজা করে খাবে।

হাসু : এই যে, ভাই। ঘরের মধ্যে কে কথা বলছ? বেরিয়ে এস।

রহমত : ভূতকে ডাকবেন না।

[ঘর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এলো।]

লোক : তোমরা কে ভাই? কী চাও?

হাসু : আমরা খুব দুঃখী মানুষ। তুমি কে?

লোক : আমি একজন সুখী মানুষ।

হাসু : আঁ! তোমার কোনো দুঃখ নাই?

২০১৯

লোক : না। সারা দিন বনে বনে কাঠ কাটি। সেই কাঠ বাজারে বেচি। যা পাই, তাই দিয়ে চাল কিনি, ডাল কিনি। মনের সুখে খেয়ে দেয়ে গান গাইতে গাইতে শুয়ে পড়ি। এক ঘুমেই রাত কাবার।

হাসু : বনের মধ্যে একলা ঘরে তোমার ভয় করে না? যদি চোর আসে?

লোক : চোর আমার কী চুরি করবে?

হাসু : তোমার সোনাদানা, জামাজুতা?

(লোকটি প্রাণখোলা হাসি হাসছে)

রহমত : হা হা করে পাগলের মতো হাসছ কেন ভাই!

লোক : তোমাদের কথা শুনে হাসছি। চোরকে তখন বলব, নিয়ে যাও, আমার যা কিছু আছে নিয়ে যাও।

হাসু : তুমি তাহলে সত্যিই সুখী মানুষ।

লোক : দুনিয়াতে আমার মতো সুখী কে? আমি সুখের রাজা। আমি মস্ত বড় বাদশা।

রহমত : ও বাদশা ভাই, তোমার গায়ের জামা কোথায়? ঘরের মধ্যে রেখেছ? তোমাকে একশ টাকা দেব। জামাটা নিয়ে এস।

লোক : জামা!

রহমত : জামা মানে জামা! এই যে, আমাদের এই জামার মতো জিনিস। তোমাকে পাঁচশ টাকা দেব। জামাটা নিয়ে এস, মোড়লের খুব কষ্ট হচ্ছে।

লোক : আমার তো কোনো জামা নাই ভাই!

হাসু : মিছে কথা বল না।

লোক : মিছে বলব কেন? আমার ঘরে কিছু নাই। সেই জন্যই তো আমি সুখী মানুষ।

শব্দার্থ ও টীকা

কবিরাজ — বৈদ্য। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে যিনি চিকিৎসা করেন।

নাড়ি পরীক্ষা — কবজির নাড়ির অবস্থা দেখে রোগ নির্ণয়।

মূর্খ — নির্বোধ, বোকা, অজ্ঞ।

শ্রবণ — কানে শোনা।

জবরদস্তি — জোরাজুরি।

ব্যামো — অসুখ, রোগ, ব্যারাম।

তাজ্জব — অদ্ভুত, বিস্ময়কর।

প্রাণখোলা — অকৃত্রিম উদার খোলা মনের।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ নাটিকা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করবে যে, অন্যায় ও অনৈতিকভাবে উপার্জিত অর্থ-বিত্তই মানুষের অশান্তির মূল কারণ। বরং সৎ পথে নিজ পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ করলেই জীবনে শান্তি মেলে। সুতরাং নীতিহীন পথে সম্পদ উপার্জনের পথ পরিহার করাই উত্তম।

পাঠ-পরিচিতি

'সুখী মানুষ' মমতাজ উদ্‌দীন আহমদের একটি নাটিকা। এর দুটি মাত্র দৃশ্য। নাটিকাটির কাহিনীতে আছে, মানুষকে ঠকিয়ে, মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে, ধনী হওয়া এক মোড়লের জীবনে শান্তি নেই। চিকিৎসক বলেছেন, কোনো সুখী মানুষের জামা গায়ে দিলে মোড়লের অসুস্থতা কেটে যাবে। কিন্তু পাঁচ গ্রাম খুঁজেও একজন সুখী মানুষ পাওয়া গেল না। শেষে

২০১৮

একজনকে পাওয়া গেল, যে নিজের শ্রমে উপার্জিত আয় দিয়ে কোনোভাবে জীবিকানির্বাহ করে সুখে দিনাতিপাত করছে। তার কোনো সম্পদ নেই, ফলে চোরের ভয় নেই। সুতরাং শান্তিতে ঘুমোনোর ব্যাপারে তার কোনো দুশ্চিন্তাও নেই। শেষ পর্যন্ত সুখী মানুষ একজন পাওয়া গেলেও দেখা গেল তার কোনো জামা নেই। সুতরাং মোড়লের সমস্যার সমাধান হলো না। লেখকের বক্তব্য খুব স্পষ্ট। তা হলো, সম্পদই অশান্তির কারণ। সুখ একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। একজনের অনেক সম্পদ থেকেও সুখ নেই। আবার আরেকজনের কিছু না থাকলেও সে সুখী থাকতে পারে।

লেখক-পরিচিতি

মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সরকারি কলেজে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা শেষে ১৯৯২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। নাট্যকার ও নাট্যাভিনেতা হিসেবে তিনি বাংলাদেশে একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা— নাটক : 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা', 'রাজা অনুস্বারের পালা', 'সাত ঘাটের কানাকড়ি', 'আমাদের শহর', 'হাস্য লাস্য ভাষ্য'; প্রবন্ধ-গবেষণা : 'বাংলাদেশের নাটকের ইতিবৃত্ত', 'বাংলাদেশের থিয়েটারের ইতিবৃত্ত' ইত্যাদি। এছাড়া তিনি লিখেছেন গল্প, উপন্যাস ও সরস রচনা। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি শিশু একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদকসহ বিভিন্ন সাহিত্য-পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. 'অর্থ-ঐশ্বর্যই সুখের একমাত্র নিয়ামক'—এ বিষয় অবলম্বনে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে)।

খ. তোমার আশেপাশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মতামত অবলম্বনে 'সুখ' বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর (একক কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'সুখী মানুষ' নাটিকার দৃশ্য সংখ্যা কত ?

ক. এক খ. দুই
গ. তিন ঘ. চার

২। 'সুখী মানুষ' নাটিকার মোট চরিত্র সংখ্যা কত ?

ক. পাঁচ খ. ছয়
গ. সাত ঘ. আট

৩। 'মনের মধ্যে অশানিত থাকলে ওষুধে কাজ হয় না'—এ কথার অর্থ কী ?

ক. মনের পবিত্রতা সুস্থতার পূর্বশর্ত খ. প্রকৃত সুখ মোহমুক্তির মধ্যে
গ. নির্লোভ হলে সুস্থ থাকা যায় ঘ. কৃপণতাই ধনীদের মূল অসুখ

৪. ‘সম্পদই অশান্তির মূল কারণ’—এ উক্তির ভাবগত সংগতি আছে কোনটির সঙ্গে ?

ক. অপচয় কর না, অভাবে পড় না খ. লাভের ধন পিঁপড়ায় খায়

গ. লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু ঘ. অতি লোভে তাঁতি নষ্ট

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

একজন লোকের অনন্ত ক্ষুধা। সে যা পায় তাই খায়। রেশনের চাল, গম, রিলিফের লোটাবাটি কম্বল। খায় পাথর পর্যন্ত। বদ হজম না হয়ে যায় কোথায় ? ভারমুক্ত হবার জন্য ছটফট করছে। কিন্তু হাজার মানুষের দীর্ঘশ্বাসের বদ প্রভাব যে তার ওপর। পেট কাটা ছাড়া উপায় নেই। আঁৎকে ওঠে লোকটি।

৫. লোকটিকে কার সাথে তুলনা করা যায় ?

ক. রহমানের খ. মোড়লের

গ. হাসুর ঘ. কবিরাজের

৬. তুলনাটা এ কারণে যে তারা উভয়ই—

i. পরধন অপহরণকারী

ii. নৈতিক আদর্শ বিবর্জিত

iii. নির্দয় ও মানবপ্রেম শূন্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক দুটি পড়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও :

১. জোবেদ আলী ইউনিয়ন পরিষদের একজন সদস্য। এই নিয়ে টানা পঞ্চম বারের মত তিনি বিপুল ভোটে নির্বাচিত হলেন। হবেনই বা না কেন ? এলাকার মানুষের অসুখ-বিসুখ হলে সুস্থ না হওয়া অবধি তিনি তার শয্যা ছাড়েন না। সমস্যায় পড়লে সমাধান নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তার মুখে অন্ন রোচে না। সেই তার অসুখ হলে গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ল। চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে প্রার্থনা করল—আল্লাহ, তুমি আমাদের জোবেদ ভাইকে সুস্থ করে দাও।

ক. আয়ুর্বেদ শাস্ত্রমতে যাঁরা চিকিৎসা করেন তাঁদের কী বলে ?

খ. হাসু মোড়লের মৃত্যুকামনা করে কেন ?

গ. জোবেদ আলীর সঙ্গে 'সুখী মানুষের যে মিল আছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মোড়ল যদি জোবেদ আলীর মতো হতেন তাহলে তার চিকিৎসার জন্য সুখী মানুষের জামা তালাশ করতে হতো না।'—বিশ্লেষণ কর।

২. সেলিম সাহেব নানা উপায়ে নানা পন্থায় সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। নদীর পাড় ভেঙ্গে পড়ার মতো ইদানিং বিভিন্ন অজুহাতে সে পাহাড়ের বিরাট বিরাট অংশ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। রাতে দুশ্চিন্তায় ঘুম হয় না। তার মনে হচ্ছে যাকে তিনি এক সময় সুখের উৎস ভেবে ছিলেন তাই হয়ে উঠেছে এখন অসুখের মূল কারণ। ভাঙ্গান যেভাবে লেগেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তেই যাবে।

ক. নাট্যকার মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ-এর পেশাগত পরিচয় কী ?

খ. হাসু মোড়লের আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও তার অকল্যাণ কামনা করে কেন ?

গ. মোড়ল চরিত্রের সঙ্গে সেলিম সাহেবের চরিত্রের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মোড়ল আর সেলিম সাহেবের অসুখের মূল কারণ অভিন্ন সূত্রে গাঁথা।'—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২০১৯

শিল্পকলার নানা দিক

মুস্তাফা মনোয়ার

'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের এই কথাগুলিতে শিল্পকলার মূল সত্যটি প্রকাশ পেয়েছে। সব মানুষই জীবনের এই আনন্দকে পাওয়ার জন্যে কত রকম চেষ্টা করে যাচ্ছে। আনন্দ প্রকাশ জীবনীশক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। আনন্দকে আমরা বুঝি রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ ইত্যাদির সাহায্যে, ইন্দ্রিয়সকলের সাহায্যে। মানুষ যখন আনন্দ পায় তখন সে তার মনকে প্রকাশ করতে চায়—নানা রূপে। তাই সৃষ্টি হলো চিত্রশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, সংগীতশিল্পী, কবি, সাহিত্যিক। পুরাকালের গুহামানুষ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষ নিজের পাওয়া আনন্দকে সুন্দরকে অন্য মানুষের মধ্যে বিস্তার করতে চেয়েছে। তাই সৃষ্টি হয়েছে নানান আঙ্গিকের শিল্পকলা। যেমন—চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নৃত্যকলা, সংগীতকলা, অভিনয়কলা, চলচ্চিত্র, স্থাপত্য ইত্যাদি কলাভঙ্গি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষ তার নিত্যনতুন অবদান রেখে চলেছে শিল্পকলার বিস্তীর্ণ অঙ্গনে। শিল্পকলার একটি অস্পষ্ট অর্থ আমরা বুঝতে পারি কিন্তু শিল্পকলার সঠিক অর্থ কী আর শিল্পকলার গুণাগুণ কী, এই প্রশ্ন যদি কেউ করে, তাহলে উত্তর দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন গান শুনে ভালো লাগে, ছবি দেখে ভালো লাগে, কিন্তু ভালো লাগে কেন? এই প্রশ্ন নিয়ে মানুষের মন চিন্তা-ভাবনা করতে লাগল। দেখা গেল, সকল শিল্পকলায় রূপ আছে, ছন্দ আছে, সুর আছে, রং আছে, বিশেষ গড়ন আছে, সবকিছুকে সাজাবার একটি সুবিন্যস্ত নিয়ম আছে। এই নিয়মটি লুকিয়ে থাকে, নিজেকে প্রকাশ করে না, সুন্দরের মধ্যে মিলেমিশে একটা বন্ধন সৃষ্টি করে। নিয়মটি না জানলেও সুন্দরকে চেনা যায়। একটি উপমা দেয়া যাক। পৃথিবীর সব ফুলই একই নিয়ম মেনে ফুল নাম পেয়েছে। আমরা দেখে বলি সুন্দর। এর নিয়মটি হলো, একই বিন্দু থেকে সকল পাপড়ি বিন্দুর চারিদিকে ছড়িয়ে থাকবে। কিন্তু এক নিয়ম মেনেই কত রকম ফুল। নিয়ম মেনেও ফুল স্বাধীনভাবে ফুটে ওঠে। তোমাদের এখন সুন্দরের নিয়ম জানতে হবে না, সুন্দর লাগলেই সুন্দর বলবে। সুন্দর দেখতে দেখতেই একদিন সুন্দরের বিশেষ বিশেষ নিয়মগুলি জানতে পারবে। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, সুন্দরকে জানার যে জ্ঞান তার নাম 'নন্দনতত্ত্ব'। নন্দনতত্ত্ব মানে সুন্দরকে বিশ্লেষণ করা, সুন্দরকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা। সব সুন্দরের সৃষ্টির মধ্যেই একটা রূপ আছে, তার নাম স্বাধীনতা—অপর নাম যা খুশি তাই করা। যে কাজ সকলকে আনন্দ দেয় খুশি করে, তাই সুন্দর। স্বার্থপর বা অসংগত আমি-র খুশি নয়, অনেক মনে খুশির বিস্তার করা আমি। অন্ধকার ঘর আলোকিত করবার জন্যে নিয়ম মেনে প্রদীপ জ্বালাতে হয়, ঘরে অসংগত আগুন লাগিয়ে ঘর আলোকিত করা নয়।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, কত রকম জিনিস প্রয়োজন হয়—ঘটি, বাটি থেকে বিছানাপত্র। শুধু প্রয়োজন মিটলেই মানুষ খুশি হয় না—মানুষের মন বলে, প্রয়োজন মিটলেই হবে না তাকে সুন্দর হতে হবে। যেমন নকশি কাঁথা, রাত্রে বিছানায় গায়ে দিয়ে শোওয়ার জন্য একটি সামগ্রী—সেটা তো সুন্দর-অসুন্দর হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই প্রয়োজনের জিনিসকে সুই আর রঙিন সুতা দিয়ে অপূর্ব নকশা করে সাজিয়েছে গাঁয়ের বধূরা। নকশি কাঁথা দেখলেই সুন্দর লাগে, জিনিসটির প্রয়োজনের কথা মনেই পড়ে না। এ কারণেই সকল জ্ঞানী মানুষ বলেন, সব সুন্দরই সরাসরি প্রয়োজনের বাইরে। প্রয়োজনের কাজ মিটল তো শরীরকে তৃপ্ত করল, আর প্রয়োজনের বাইরে যে সুন্দর তা মনকে তৃপ্ত করল। অর্থাৎ প্রয়োজন আর অপ্রয়োজন মিলিয়েই মানুষের সৌন্দর্যের আশা পূর্ণ হয়।

এবার বিভিন্ন শিল্পকলা নিয়ে সংক্ষিপ্ত করে কিছু বলা যাক। ছবি আঁকা। বিশ্বের সকল দেশেই শিশুরা ছবি আঁকে। বাংলাদেশের ছোটরাও খুব সুন্দর ছবি আঁকতে পারে। ছবি আঁকা মানে 'দেখা শেখা'। ছোটরা প্রকৃতিকে দেখে, মা-বাবা, ভাই-বোন মিলিয়ে একটা সমাজকে দেখে। প্রতিদিনের দেখা বিষয়বস্তু, রং, গড়ন, আকৃতি শিশুমনের কল্পনার সঙ্গে মিলেমিশে যায়। নানা রকম গল্প শুনে, দেশের কথা শুনে, কবিতা ছড়া শুনেও শিশুমনে ছবি তৈরি হতে থাকে। এ সকল দেখা-অদেখা বস্তু নিয়ে শিশুরা ছবি আঁকে কল্পনা-বাস্তব মিলিয়ে। নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করতে শেখে।

সকল শিল্পকলার মধ্যে কতকগুলি মূল বস্তু থাকে যেমন—বিন্দু, রেখা, রং, আকার, গতি বা ছন্দ, আলোছায়া গাঢ়-হালকার সম্পর্ক ইত্যাদি। এই সকলের মিলনেই হয় ছবি বা ভাস্কর্য। আর আছে মাধ্যম, অর্থাৎ কোন মাধ্যমে শিল্পসৃষ্টি হয়েছে। চিত্রকলার মাধ্যম হলো কালি-কলম, জল রং, প্যাস্টেল রং, তেল মিশ্রিত রং ইত্যাদি। ছোটদের জন্য প্যাস্টেল ও জল রং ব্যবহার করা সহজ হয়। বাংলাদেশে পুরাকালে জল রং দিয়েই ছবি আঁকত শিল্পীরা। পুরাতন পুথিতে তালপাতায় আঁকা ছবির বহু নিদর্শন আছে। বর্তমানেও জল রং অত্যন্ত প্রিয়, তবে এখন আর কেউ তালপাতায় আঁকে না, কাগজে আঁকে।

ভাস্কর্য। নরম মাটি দিয়ে কোনো কিছুর রূপ দেয়া বা শক্ত পাথর কেটে কোনো গড়ন বানানো। বিশেষ এক ধরনের ছাঁচ বানিয়ে গলিত মেটাল ঢেলে গড়ন বানানো, এই ধরনের কাজকে বলে ভাস্কর্য। আমাদের দেশে পোড়ামাটির ভাস্কর্য খুব প্রসিদ্ধ ছিল।

আমাদের সংস্কৃতি বা কালচার গড়ে উঠেছে নানান শিল্পকলার কারুকাজ দিয়ে। সকল শিল্পীর একটি দায়িত্ব আছে–দেশের ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করা। বাংলায় একটি কথা আছে—'কালি কলম মন, লেখে তিন জন'—কালি মানে দেশের ঐতিহ্যে হাজার বছর প্রবাহিত কালি, কলম হলো শিল্পসৃষ্টির বর্তমান সরঞ্জাম, আর মন হলো বর্তমান যুগের সঙ্গে ঐতিহ্যের মিল করে নিজেকে প্রকাশ করার মন। একটি দেশকে জানা যায় দেশের মানুষকে জানা যায় তার শিল্পকলা চর্চার ধারা দেখে। শিল্পকলা চর্চা সকলের জন্য অপরিহার্য।

শব্দার্থ ও টীকা

ভুবন — পৃথিবী, জগৎ, ভূমণ্ডল।

শিল্পকলা — চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নাচ, গান প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত।

রস — সাহিত্য পাঠ করে বা ছবি দেখে মনে যে অনুভূতি জাগে।

পুরাকাল — প্রাচীনকাল, অনেক আগেকার সময়।

গুহা-মানুষ — প্রাচীনকালে গুহায় বসবাসকারী মানুষ।

ভাস্কর্য — ইংরেজিতে বলে স্কাল্পচার (Sculpture)। পাথর খোদাই করে বা মাটি দিয়ে আকার বা গড়ন নির্মাণের কাজ।

স্থাপত্য — গৃহ বা ভবনাদি নির্মাণের কাজ। ইংরেজিতে বলে আর্কিটেক্চার।

প্রাত্যহিক জীবন — প্রতিদিনের জীবন।

নকশি কাঁথা — সুন্দর নকশা সৃষ্টি করে তৈরি কাঁথা। বাংলাদেশের লোকশিল্পের একটি সমৃদ্ধ শাখা।

গড়ন — আকার, আকৃতি, রূপ, ইংরেজিতে যাকে বলে ফর্ম। এ রচনায় শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

পাঠের উদ্দেশ্য

রচনাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীদের মনে সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি হবে। চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি সম্পর্কে তারা আগ্রহী হবে। তারা নতুন কিছু সৃষ্টির ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হবে।

পাঠ-পরিচিতি

এই রচনাটিতে লেখক সুন্দরের ধারণা ব্যক্ত করেছেন। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সংগীত, নৃত্য, কবিতা সবকিছুর মধ্য দিয়েই সুন্দরকে প্রকাশ করা হয়। প্রকৃতি জগতে সুন্দরের প্রকাশ ঘটে নানাভাবে। তা দেখে মানুষ নতুন করে সুন্দরকে সৃষ্টি করে। বিভিন্ন মাধ্যমে চলে সৃষ্টির এই প্রক্রিয়া। কখনো রেখার সাহায্যে, কখনো রঙের সাহায্যে, কখনো মাটি বা পাথরের সাহায্যে সুন্দরকে সৃষ্টি করা হয়। সুন্দর বোধ মানুষের মনকে তৃপ্ত করে। মানুষকে তা পরিশীলিত করে। সুন্দরের সৃষ্টিতে সকলেরই চেষ্টা করা উচিত।

লেখক-পরিচিতি

মুস্তাফা মনোয়ার একজন চিত্রশিল্পী। তাঁর জন্ম ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে, ঝিনাইদহ জেলার মনোহরপুর গ্রামে। কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর পিতা। তিনি কলকাতা আর্ট কলেজের কৃতী ছাত্র। ঢাকায় চারুকলা কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেছেন। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও শিল্পকলা একাডেমিতে মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশে পাপেট থিয়েটার ও অ্যানিমেশন শিল্পকলায় আধুনিকতা প্রচলনে তিনি অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়া 'মনের কথা' নামে বাংলাদেশ টেলিভিশনে দীর্ঘকাল শিশুদের উপযোগী শিল্পকলাবিষয়ক একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। ১৯৭২ সাল থেকে প্রচারিত শিশু প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে বহুল জনপ্রিয় 'নতুন কুঁড়ি' অনুষ্ঠানের রূপকার তিনি। টেলিভিশনের অনুষ্ঠান প্রযোজনায় তিনি মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশিষ্ট নৃত্য পরিকল্পনাকারী, সংগীত পরিচালক, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ সাফ গেমসের সফল মাসকট নির্মাতা তিনি। একুশে পদকসহ বহু পদক ও পুরস্কার লাভ করেছেন তিনি।

কর্ম-অনুশীলন

ক. সুনির্দিষ্ট বিষয় অবলম্বনে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতার আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে)।

খ. শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে স্পষ্ট ও সুন্দর হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতার আয়োজন কর।

গ. বাস্তবে বা ছবিতে দেখা তোমার ভালো লাগা কোনো একটি আলোকচিত্র বা ভাস্কর্য বা স্থাপত্য সম্পর্কে তিন-চার অনুচ্ছেদের একটি রচনা লেখ।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মুস্তাফা মনোয়ার হলেন একজন—

ক. চিত্রশিল্পী খ. ভাস্কর্যশিল্পী

গ. স্থাপত্যশিল্পী ঘ. কারুশিল্পী

২. কোনটির মধ্য দিয়ে একটি দেশ এবং দেশের মানুষকে জানা যায় ?

ক. শিল্পকলাচর্চা খ. সাহিত্যচর্চা

গ. বিজ্ঞানচর্চা ঘ. চিত্রকলাচর্চা

৩। 'সব সুন্দরই সরাসরি প্রয়োজনের বাইরে' বলতে বোঝানো হয়েছে—

i. প্রয়োজনের মধ্যে সৌন্দর্য প্রকাশ পায় না

ii. অপ্রয়োজনীয় অংশই কেবল মানব-মনকে তৃপ্ত করে

iii. প্রয়োজন আর অপ্রয়োজন মিলে সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

তকিব হাসান কম্পিউটার সায়েন্সে অনার্স পড়ছেন, সারাক্ষণ তার রুমের দরজা-জানালা বন্ধ করে কম্পিউটার নিয়ে তিনি বসে থাকেন। ছোট বোন মোহনা পূর্ণিমার রাতে ছাদে গিয়ে চাঁদ দেখতে বললে সে বলে—ছাদে গিয়ে চাঁদ দেখার কী আছে, জানালা দিয়েই তো চাঁদ দেখা যায়। সে সব সময় মুখটা কেমন গম্ভীর করে বসে থাকে। সবার সাথে মেশেও না।

৪. শিল্পকলার বিচারে তকিবের মনে কীসের অভাব আছে ?

ক. আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষা খ. ভাব ও অনুসন্ধিৎসা

গ. আনন্দ ও অনুভূতি ঘ. আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ

৫. 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের আলোকে তকিব হাসানের উক্ত অভাববোধ থাকার কারণ—

ক. শিল্পচর্চার অভাব খ. শিল্পকলার প্রতি অনাসক্তি

গ. সাহিত্যচর্চার অভাব ঘ. প্রকৃতির প্রতি অনাসক্তি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মেহেরুন্নেসা এবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হয়েছেন। নবীনবরণ অনুষ্ঠানে নাট্যাভিনয় দেখে তিনি বান্ধবীদের সাথে ক্যাম্পাস ঘুরতে ঘুরতে এলেন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে। সেখানে দেখেন—এক হাতে বন্দুক ধরে এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বিশালাকার এক ভাস্কর্য। নাম—সংশপ্তক। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও যে যুদ্ধ চালিয়ে যায় তাকেই বলে সংশপ্তক। ৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথা স্মরণ করে এই ভাস্কর্যটি বানানো হয়েছে। মনটা ভরে গেল মেহেরুন্নেসার।

ক. মুস্তাফা মনোয়ার কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

খ. 'প্রয়োজন আর অপ্রয়োজন মিলেই মানুষের সৌন্দর্যের আশা পূর্ণ।'—কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

গ. নবীনবরণ অনুষ্ঠানে মেহেরুন্নেসা শিল্পকলার কোন দিকটি দেখেছেন? এর বর্ণনা দাও।

ঘ. 'মেহেরুন্নেসার দেখা সংশপ্তকই শিল্পকলার প্রধান দিক।'—মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর।

২. নন্দলাল বসু তাঁর 'শিল্পকলা' গ্রন্থে বলেছেন—'যে সৃষ্টির মধ্যে মানুষের প্রয়োজন সাধন অপেক্ষা অহেতুক আনন্দ বেশি, যাহাতে মানুষের জৈব অপেক্ষা আত্মিক ও মানসিক আনন্দ সৃষ্টি বেশি, তাহাকে আমরা ললিতকলা বলিয়া আখ্যায়িত করিতে পারি। আবার যাহাকে আমরা ললিতকলা বলি, তাহাও আরেক দিক হইতে কারুকলা শ্রেণিভুক্ত হইতে পারে। স্থাপত্যবিদ্যাপ্রসূত সুরম্য প্রাসাদকে যখন মানুষের বসবাস উপযোগী করিয়া দেখি তখন তাহা কারুশিল্প। আবার উহাকে যখন রূপময় অসীম সৌন্দর্য সৃষ্টি হিসেবে দেখি তখন তাহা চারুকলা।'

ক. 'পুরাকাল' শব্দের অর্থ কী ?

খ. শিল্পকলাচর্চা সকলের পক্ষে অপরিহার্য কেন ?

গ. উদ্দীপকের ললিতকলা বলতে 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের যে বিষয়টিকে নির্দেশ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকে উল্লিখিত চারুকলা ও কারুকলার সমন্বিত রূপই শিল্পকলা —'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

মদিনার পথে

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

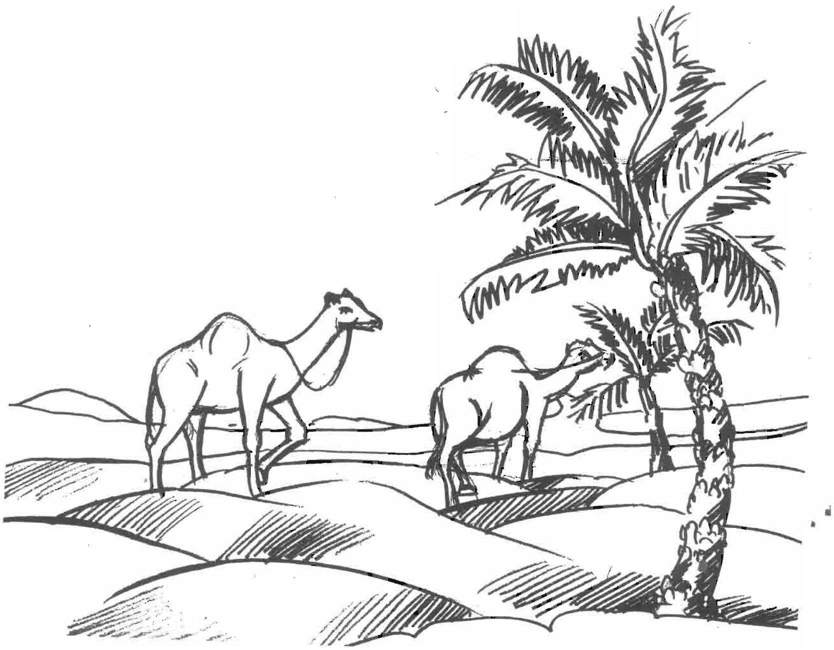

মদিনাবাসীর আনন্দ আর ধরে না। আল্লাহ্‌র নবি তাহাদের কাছে আসিতেছেন। সবখানেই এই প্রসঙ্গে-এ কথার আলোচনা। গৃহে গৃহে নবির অভ্যর্থনার আয়োজন হইতে লাগিল।

মক্কার অত্যাচারিত মুসলমানগণ একে একে সবাই চলিয়া গেলেন। হজরত তাহাদের ফেলিয়া কখনো আগে যাইতে পারেন না। কুরাইশের নির্যাতন এড়াইবার জন্য তিনি মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় পাঠাইয়াছিলেন। নিজে শত্রুর নির্মম আঘাত সহিয়া ছিলেন মক্কায়। এবারও শেষ পর্যন্ত বৈরিদলের সম্মুখে রহিলেন হজরত স্বয়ং, প্রিয় সহচর আলী (রা:), প্রিয়তম ভক্ত মহামতি আবু বকর (রা:) তিনটি মাত্র প্রাণী মক্কায় রহিয়া গেলেন। কুরাইশ দলে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গেল। সকল মুসলমান মক্কা ছাড়িয়াছেন; তাহাদের শেষ শিকার মুহম্মদও (স.) বুঝি হাত ছাড়া হইয়া যায়।

আর বিলম্বের অবসর নাই। হজরত যে কোনো দিন মদিনায় চলিয়া যাইতে পারেন। হজরতের নিকটতম বৈরি আবু জেহেল মক্কার সকল গোত্রের কাছে খবর পৌঁছাইতে লাগিল। স্থির হইল, দারুন-নদ্‌ওয়ার বৈঠক বসিবে। যাহা করিতে হয় মক্কাবাসীরা সকলে মিলিয়া করিবে। নয়তো হাসিম ও মুত্তালিব গোত্রের প্রবল বাঁধার সম্মুখে তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে।

রাত্রিতে মন্ত্রণা-সভা-নদ্‌ওয়ার অধিবেশন শুরু হইয়াছে। কাবা গৃহের চাবি-রক্ষক ওসমান ইবনে-তালহা; মক্কায় সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি আবু সুফিয়ান ইবনে-হারব; নগরের খাজাঞ্চিখানার কর্তা হারেস ইবনে-কায়েস প্রমুখ বৈঠক সমুপস্থিত। আবদুল ওজ্জা ইবনে কোসার বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, প্রবীণ। তিনি আজ সভাপতির আসন

গ্রহণ করিয়াছেন। দাওয়ার সর্বপ্রধান রক্ষী খালেদ বিন-ওলিদ আজ মুক্ত কৃপাণ হস্তে পাহারায় নিযুক্ত। মুহম্মদের (স.) সম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বন করা যায় ইহাই আজ আলোচনার বিষয়।

আবু জেহেল জানিত, কোনো একটি গোত্রের লোক হজরতকে হত্যা করিবার দায়িত্ব স্বীকার করিবে না। হাসিম ও মুত্তালিব গোত্রের ক্রোধকে সবাই ভয় করে। কিন্তু সকল গোষ্ঠীর লোক যদি সম্মিলিতভাবে এই কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে আর কিসের ভয়? হজরতের আত্মীয়-স্বজনেরা কখনো মক্কার সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে সাহসী হইবে না। তাছাড়া মক্কার বিভিন্ন গোত্র পরস্পরকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত। একের বিপদে অন্যেরা তাহার হইয়া লড়াই করিবেই, এমন নিশ্চয়তা কিছু ছিল না। কিন্তু যদি আজ সকল গোত্র একই অপরাধে অপরাধী হয়, তবে সবাই হাশিমীয়দের শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে এবং একযোগে তাহাদের সহিত লড়িতে বাধ্য হইবে। এই ভাবিয়া সুচতুর আবু জেহেল প্রস্তাব করিল; 'মুহম্মদ (স.) কে রক্ষা করিতে আজ আর কেহ নাই। তাঁহার সঙ্গী শিষ্যেরা সবাই মদিনায় চলিয়া গিয়াছে; হাশিমীয়দের মধ্যে বিচক্ষণ ও শক্তিমান নেতা যিনি ছিলেন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এমন চমৎকার সুযোগ ছাড়া চলে না। আজ যদি আমরা মুহম্মদ (স.) কে হত্যা না করি, সে অবিলম্বে মদিনা নগরীর অধিপতি হইয়া বসিবে, সুবিধা পাইলে মক্কা আক্রমণ করিয়া প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিবে। এই বিপদ আমরা ইচ্ছা করিয়া ডাকিয়া আনিবো কেন? তাহার চেয়ে আমরা একযোগে কাজ করি, সকল গোত্র হইতে এক একজন সাহসী শক্তিমান যুবক বাছিয়া লওয়া হোক, তাহারা একযোগে মুহম্মদ (স.) কে আক্রমণ করিবে, সবাই তরবারির আঘাতে তাহার দেহ টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। তখন দেখা যাইবে, হাশিম ও মুত্তালিব গোষ্ঠী মক্কার সকল গোত্রের বিরুদ্ধে কি করিয়া অস্ত্রধারণ করে।'

সকলেই আবু জেহেলের প্রস্তাব সমীচীন মনে করিল। প্রধান প্রধান নেতারা তাহার বুদ্ধির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। স্থির হইল: তিলার্ধ কালও আর বিলম্ব নয়। বিলম্বে শিকার হাতছাড়া হইতে পারে। এখন এই মুহূর্তে সকল গোত্রের সশস্ত্র যুবকদল মুহম্মদ (স.) এর বাড়ি ঘেরাও করিবে।

নদ্ওয়ার বৈঠক ভাঙ্গিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই অমানিশার কৃষ্ণবুক চিরিয়া অনেকগুলি শাণিত কৃপাণ ঝিকমিক করিয়া উঠিল। হজরতের গৃহের চারিদিকে মক্কার হিংস্র রক্তপিপাসু যুবকদল সমবেত হইল।

গভীর রাত্রিতে হাশিমীয়দের ঘুম ভাঙ্গাইবার দরকার নাই; তাহাতে আসল মতলবই ফাঁসিয়া যাইতে পারে। যুবকগণ স্তব্ধ নীরবতায় ঊষার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মুহম্মদ (স.) শয্যা ছাড়িয়া নিশা-অবসানে বাহিরে আসিলেই হয়, কৃপাণের পর কৃপাণ হানিয়া তাহারা তাঁহার দেহটিকে শতখণ্ড করিয়া ফেলিবে। হাশিমীয়দের সহিত যুদ্ধ? তাহার জন্য তো সকলেই প্রস্তুত, সুতরাং তারপর শঙ্কা কিসের!

ওদিকে হজরতের মদিনা গমনের সংকল্প করা হইয়াছে; আবু বকর (রা) তাঁহার সঙ্গী। দুইটি তেজি উটের পিঠে তাহারা দুইজন সওয়ার হইলেন। আবু বকরের (রা) কন্যা আসমা ও আয়েশা কিছু আহারীয় তৈরি করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাই তাঁহাদের সম্বল।

নবির সত্য লাভের ত্রয়োদশ বৎসর, সফর মাসের কৃষ্ণপক্ষের শেষ নিশা। চারিদিকে গভীর অন্ধকার। ইহাকে আবরণ করিয়া আল্লাহ্‌র পথে দুইটি পথিক জন্মভূমি ছাড়িয়া চলিলেন মক্কার তিন মাইল দূরে সওর পর্বতে। সেইখানে গিয়া একটি নিভৃত গুহায় তাঁহারা আশ্রয় লইলেন।

হজরত যাত্রার সময় আলী (রা) কে মক্কায় রাখিয়া গেলেন। আলী (রা) হজরতের চাদরে নিজের দেহ আবৃত করিয়া তাহাঁরই শয্যায় শয়ন করিলেন। অমানিশার অবসানে নৃশংস কুরাইশ যুবকদল হজরতের খোঁজ করিতে গিয়া দেখিল, ২০১৯

মুহম্মদ (স.) নাই, আলী (রা) তাঁহার স্থানে শুইয়া আছেন। শিকার ভাগিয়াছে দেখিয়া তাহারা একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহারা আলীকে (রা) জিজ্ঞাসা করিল : বলো, মুহম্মদ (স.) কোথায়?

আলী (রা:) মনে মনে হাসিলেন; আবু জেহেলকে সামনে দেখিয়া বলিলেন : তোমরা তো বাপু আমাকে প্রহরী নিযুক্ত করো নাই। দরকার হয়, তোমরা নিজেরাই তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করো। মুহম্মদ (স.) চলিয়া গিয়াছেন। এই সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ঘাতকগণের রক্তপিপাসা অতি ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা পথে পথে, অলিতে গলিতে, পর্বতে প্রান্তরে মুক্ত তরবারি হস্তে হজরতের খোঁজে বাহির হইল। ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ দলপতিগণ আন-নদ্ওয়ার পক্ষ হইতে ঘোষণা করিল: একশত উষ্ট্র পুরস্কার। মুহম্মদ (স.) ও আবু বকর (রা) কে যে জীবন্ত ধরিয়া আনিতে পারিবে অথবা তাহাদের ছিন্ন মুণ্ডু আনিয়া হাজির করিবে তাহাকে একশত তেজি উষ্ট্র বখ্শিস দেওয়া হইবে।

আবু বকরের (রা) সহিত হজরত গিয়াছেন, এ সংবাদ জানিতে আবু জেহেলের বাকি ছিল না। রক্তভুক কুকুরদের হজরত ও আবু বকর (রা) এর পিছনে লেলাইয়া দিয়া সে বাড়িতে খোঁজ করিতে আসিল। আবু বকর (রা) এর বাড়ির সদর দরজায় করাঘাতের শব্দ হইল। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য ভিতর হইতে আসমা বাহির হইয়া আসিলেন। আবু জেহেল ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল; বল, কোথায় তোর বাপ?

আবু জেহেলের রক্তচক্ষু ও ক্রোধ-কঠোর কণ্ঠ আসমাকে শঙ্কিত করিল না। পিতার সম্বন্ধে কোনো খবরই তিনি আবু জেহেলকে দিলেন না। রাগে অধীর হইয়া সে তখন বালিকার মুখে ভীষণ বেগে এক চড় বসাইয়া দিলো।

রক্তকামী যুবকদলের উৎসাহ পুরস্কার-লোভ দশগুন বাড়িয়া গিয়াছে। তাহারা ক্ষিপ্তের মতো নাঙ্গা তলোয়ার হাতে মুহম্মদ (স.) এর শির লইবার জন্য অশ্ব-পৃষ্ঠে ছুটাছুটি করিতেছে। মুহম্মদ (স.)! কোথায় মুহম্মদ (স.)?

কিন্তু মুহম্মদ (স.) ও তাঁহার সঙ্গীকে কেহ পাইল না।

একবার কয়েকটি যুবক সওর গিরি-গুহার অতি কাছে আসিয়া পড়িল; তাহাদের অশ্বের দ্রুত পদধ্বনি, তাহাদের ব্যস্ত কণ্ঠের আওয়াজ আবু বকর (রা) শুনিতে পাইলেন। ভক্তের হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। এই তো শত্রু আসিয়া পড়িয়াছে। আর বুঝি নবির জীবন রক্ষা হয় না। তিনি ব্যাকুল দৃষ্টিতে হজরতের দিকে চাহিলেন, বলিলেন: হজরত কী উপায় হইবে? আমরা মাত্র দুইজন, আর উহারা সংখ্যায় কতো অধিক।

নবির কিন্তু কোনো চিন্তা-ভাবনা নাই; তিনি ধীর কণ্ঠে বলিলেন: একি বলিতেছ, আবু বকর? আমরা দুজন মাত্র নই, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন?

তিনদিন এইভাবে কাটিল। আবু বকরের (রা) পুত্র আব্দুল্লাহ্ কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ করিয়া গোপনে পিতার নিকট সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন। আমর বিন-ফোহায়রা আবু বকর (রা) এর মেষপালক ভৃত্য। রাত্রির অন্ধকারে সে সওর গুহায় ছাগদুগ্ধ পৌঁছাইয়া দিতো। আসমার তৈরি আহারীয় এবং দুগ্ধ খাইয়া তাঁহাদের এই কয়দিন কাটিল।

এদিকে তিনদিন বৃথা অনুসন্ধানের পর পুরস্কার-লোভী যুবকদল অনেকখানি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে। হজরত মুহম্মদ (স.) ও আবু বকর (রা) তাহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া মদিনায় চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাই বা কেমন করিয়া সম্ভব? এতোগুলি মানুষের সর্তক চক্ষুকে এড়াইয়া দুইজন লোক কীরূপে মরভূমি পাড়ি দিতে পারে? নানা সন্দেহে যুবকদের মন দোলায়িত হইতেছে। কিন্তু ভাবনায় আর ফল কি? তিন তিনটি দিন খুঁজিয়াও যাঁহাদের সন্ধান মিলিল না, তাহাদের জীবন্ত দেহ বা ছিন্ন মুণ্ডু নদ্ওয়া গৃহে আসিবে ভরসা হয় না। কিন্তু এরূপ নিরাশার ভিতরেও একশত উষ্ট্র পুরস্কারের লোভ কতগুলি হিংস্র আরব যুবককে দূর পথের সন্ধানী করিয়া রাখিল।

তৃতীয় রজনীর প্রভাতে হযরত মুহম্মদ (স.) ও আবু বকর (রা) সওর গুহা ছাড়িয়া আগেকার সেই দ্রুতগামী উট দুইটিতে সওয়ার হইলেন। সকলের চলা-পথে মদিনা যাত্রা তাঁহাদের পক্ষে নিরাপদ নয়। তাই তাঁহারা অজানা অচেনা পথ ধরিয়া চলিলেন। মরুপথে প্রদর্শক ছাড়া বেশি দূরে যাওয়া সম্ভব নয়। আবু বকর (রা) পূর্বেই এজন্য আব্দুল্লাহ বিন-ওরায়কাতকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই আব্দুল্লাহ ও ভৃত্য আমর তাঁহাদের সঙ্গী হইল।

নবি বারবার অশ্রুসিক্ত চোখে জন্মভূমি মক্কার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। মনে তাঁহার শৈশবের, বাল্যের, যৌবনের কত শত স্মৃতি আসিয়া ভিড় জমাইল। আদর, স্নেহ, প্রেম, অত্যাচার, নির্যাতন সবকিছু মিলিয়া মক্কার মাটিতে এক অপূর্ব মায়া রচিত হইয়াছিল; এইখানেই তাঁহার মন স্বতঃই মূল বিস্তার করিতে চাহিতেছিল। কিন্তু তাহা হইল না তাই তাঁহার ছিন্নমূল অন্তর আর্ত বেদনায় হাহাকার করিয়া উঠিতেছিল। তথাপি বিধাতার নির্দেশ তিনি মানিয়া লইলেন। সত্যের পতাকা বহন করিয়া তিনি দূর প্রবাসে আপনার নীড় রচনা করিতে চলিলেন। লোহিত সাগরের উপকূল বাহিয়া মদিনায় দীর্ঘ পথ প্রসারিত। এই পথ ধরিয়া নবির উট, সঙ্গী আবু বকরের (রা) উট, দ্রুত পা ফেলিয়া চলিতে লাগিল।

কিন্তু কুরাইশদের রক্ত-পিপাসা তখনও তাঁহাদের পিছু ছাড়ে নাই। হযরত ও আবু বকর (রা) মদিনা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, এ সংবাদ কুরাইশগণ নিশ্চিত জানিতে পারিয়াছে। পথিপার্শ্বের সমস্ত গোত্রের মধ্যে তাহারা ঘোষণা করিয়াছে, সেই শত উষ্ট্র পুরস্কারের কথা। যে মুহম্মদ (স.) এর জীবন্ত দেহ কিংবা ছিন্ন মুন্ডু আনিবে, বীরত্বের যশ তাহার, একশত উট বখ্‌শিস তাহার। আমাদের শত্রু মুহম্মদ (স.) কে হত্যা করিতে হইবে। ইহা তো অতি সঙ্গত কার্য, ইহার উপর একশত উষ্ট্র পুরস্কার। সকলেই পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

সোরাকা সংবাদ পাইল, দূরে মক্কার পলাতক যাত্রীদের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। আর কথা কি!

কাহারও অপেক্ষা না করিয়া- কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া সে একাই বাহির হইয়া পড়িল। মুহম্মদ (স.) কে হত্যা করিবার গৌরব–সঙ্গে সঙ্গে একশত উষ্ট্র সে একাকী অর্জন করিবে।

বর্শা, তরবারি প্রভৃতি নানা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সোরাকা ঘোড়া ছুটাইয়া দিলো। প্রস্তরাকীর্ণ বালুকাময় মরু-পথ। সবাধানে না চলিলে এ পথে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। উৎসাহে সোরাকার সে কথা স্মরণ নাই। অশ্ব দ্রুত গতিতে ছুটিয়াছে। হঠাৎ একখানি পাথরে ঘা খাইয়া সে পড়িয়া গেল। কুসংস্কার পীড়িত মন তাহার হঠাৎ এই দুর্ঘটনায় অনেকখানি দমিয়া গেল। কেন এমন হইল? ভয়ে সন্দেহে তাহার চিত্ত দুলিয়া উঠিল। কিন্তু বীরত্বের গৌরব, পুরস্কারের প্রত্যাশা তখনও একেবারে নিভে নাই। খানিক ইতস্তত করিয়া সোরাকা আবার ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, ঐ মুহম্মদ (স.) চলিয়াছেন, ঐখানে গিয়া তাঁহার শির লইতে হইবে। নবজাগ্রত আশা-বিশ্বাসে সোরাকার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আশ্চর্য বিধাতার লেখা, কিছুদূর যাইতেই তাহার ঘোড়ার পিছনের দুই পা গভীর বালিতে পুঁতিয়া গেল, উহার আর নড়িবার শক্তি রহিল না। ভয়ে সোরাকার বুক কাঁপিয়া উঠিল। না, না, মুহম্মদ (স.) কে হত্যা করা যাইবে না। তাঁহার জয় অনিবার্য। সোরাকা আর বিলম্ব করিল না; সমস্ত দ্বিধা-সংকোচ ছাড়িয়া হযরতের কাছে আসিল। তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া আবু বকর (রা) বলিলেনঃ হযরত, আর রক্ষা নাই, ঐ দেখুন সশস্ত্র শত্রু আমাদের ধরিয়া ফেলিল।

নবির মুখে উদ্বেগ-আশঙ্কার চিহ্নমাত্র নাই। মুখে তাঁহার কোরানের ভাষা, বুকে তাঁহার অন্তহীন আশা, অন্তরে তাঁহার অপরিমেয় বিশ্বাস। তিনি বলিলেনঃ ভয় নাই, আবু বকর (রা) আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।

সোরাকা হজরতের কাছে আসিলে তিনি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, কে সোরাকা নাকি?

সোরাকা নবিকে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলঃ তারপর তাঁহার হাতে হাত রাখিয়া ইসলামের সত্য গ্রহণ করিল।

হজরত বলিলেনঃ সোরাকা, আজ হইতে তুমি আমার ভাই।

সোরাকার মতো আরও একটি লোক মদিনার পথে হজরতের খোঁজে ফিরিতেছিল আসলাম গোত্রের অধিনেতা বারিদা, সত্তর জন দুর্ধর্ষ আরব তাহার সঙ্গী। মুহম্মদ (স.) এর শির লইতে হইবে, তাহার কাছে ইহা তো এমন কিছু কঠিন কথা নয়। দূর হইতে পলাতক পথিকদের দেখিয়া তাহারা 'মার' 'মার' শব্দে ছুটিয়া আসিল। পশু প্রকৃতি আরব-দস্যুদের চোখে লক লক আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এইবার আর রক্ষা নাই। একদিকে নিরস্ত্র নিঃসহায় দুইটি পথিক, অন্যদিকে একাত্তর জন সশস্ত্র ঘাতক। আবু বকর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন।

কিন্তু হজরতের মুখে ভীষণ বিপদের মধ্যেও বিন্দুমাত্র উদ্বেগের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল না। তিনি প্রশান্ত বদনে কোরানের আয়াত পাঠ করিতে লাগিলেন। কোরানের অপূর্ব সুন্দর বাণী তাঁহার মধুস্রাবী কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া আকাশ-বাতাস মধুময় করিয়া তুলিল। দস্যুদলপতি বারিদা যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই হজরতের আবেগময় কণ্ঠরব আশ্চর্য মাধুরিমায় কানের ভিতর দিয়া তাহার মর্মস্পর্শ করিল। তাঁহার চরণদ্বয় ভারাক্রান্ত বাহু যুগল শিথিল হইয়া আসিল। অবশেষে বারিদা যখন হজরতের কাছে পৌঁছিল, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল।

প্রেমে-পুণ্যে উদ্ভাসিত, অতলস্পর্শ বিশ্বাসের তেজে প্রদীপ্ত নবির বদনমণ্ডল দেখিয়া দস্যুদলপতি আর স্থির থাকিতে পারিল না। হজরতের হাতে হাত রাখিয়া তখনই ইসলাম গ্রহণ করিল। তাহার সত্তর জন সঙ্গীও দীক্ষিত হইল। যাহারা আসিয়াছিল নবির প্রাণ নিতে, তাঁহারাই তাঁহার প্রচারিত সত্যে আত্মসমর্পন করিল।

বারিদা মাথার পাগড়ি বর্শাফলকে গাঁথিয়া উড়াইয়া দিলো। সত্তরখানি নাঙ্গা তলোয়ার, সত্তরটি তুণীর মুক্ত তীর উর্ধ্বে উত্তোলিত হইল। ইসলামের জয় পতাকা পত্ পত্ শব্দে উড়িতে লাগিল। নিশান বরদার বারিদার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল সত্তর জন্য রক্ষী সৈনিক।

হজরতের আগমন সংবাদ সকলকে জানাইবার জন্য বারিদা উচ্চ-কণ্ঠে বলিতে লাগিলঃ বিশ্ববাসী আনন্দ-সংবাদ শ্রবণ করো, শান্তির বার্তাবাহক আসিতেছেন, মুক্তির অধিনায়ক আসিতেছেন, সন্ধির স্থপয়িতা আসিতেছেন, ন্যায়বিচারে ইনি দুনিয়ায় ধর্মরাজ্য স্থাপন করিবেন।

[মরুভাস্কর হইতে সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

অভ্যর্থনা-আদবের সাথে গ্রহণ করা। **আবিসিনিয়া**-পূর্ব-আফ্রিকার একটি বিরাট দেশ। **নির্যাতন**-অত্যাচার। **বৈরীদল**-শত্রুদল। **হযরত আলী (রা)**-হজরতের চাচা আবু তালিবের পুত্র, হজরত তাঁর সঙ্গে নিজ কন্যা ফাতেমার বিয়ে দেন। ইনি ইসলামের চতুর্থ খলিফা। **আবু বকর (রা)**-হজরতের অন্যতম প্রিয় সঙ্গী; হজরতের ইনতিকালের পরে ইনি ইসলামের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। **দারুন নদ্ওয়া**-মক্কার একটি সভাগৃহ। যে কোনো গুরুতর সমস্যা দেখা দিলে নগরীর প্রধান ব্যক্তিরা এখানে একত্রিত হয়ে পরামর্শ করতেন। **হাসিম ও মুত্তালিব গোত্র**-হযরত মুহম্মদ (স.) এর ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি গোষ্ঠী, মুত্তালিব ছিলেন হযরতের পিতামহ আর হাসিম প্রপিতামহ। **খাজাঞ্চিখানা**-রাজকোষ, অর্থাগার। **খালেদ বিন ওলীদ**-কুরাইশদের অন্যতম বীর সেনানায়ক; ইনি পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে দিগ্বিজয়ী

সেনাপতি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। **শাণিত**-ধারালো। **কৃপাণ**-তলোয়ার। **সমীচীন**-উচিত। **অমানিশা**-অমাবস্যা। **উষার**-প্রভাতের। **শঙ্কা**-ভয়। **অবনত**-নিচু হওয়া। **গচ্ছিত**-জমা; আমানত। **নৃশংস**-নিষ্ঠুর। **বিদ্যুদ্বেগে**-বিদ্যুতের মতো বেগে; দ্রুতগতিতে। **শঙ্কিত**-ভীত। **স্বতঃই**-নিজে নিজে। **প্রস্তরাকীর্ণ**-পাথর পরিপূর্ণ। **অনিবার্য**-যা নিবারণ করা যায় না। **অপরিমেয়**-যার পরিমান নেই, অত্যধিক। **তূণীর**-চামড়া দিয়ে তৈরি তীর রাখার পাত্র। **বার্তাবহ**-যে সংবাদ বহন করে। **ভাস্কর**-সূর্য। **নিশানবরদার**-যুদ্ধক্ষেত্রে যে পতাকা বহন করে। **বিচক্ষণ**-অভিজ্ঞ।

পাঠের উদ্দেশ্য

রচনাটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা হিজরত সম্পর্কে জানতে পারবে।

পাঠ–পরিচিতি

'মদিনার পথে' রচনাংশটি মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচিত 'মরুভাস্কর' গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। আলোচ্য অংশে হযরত মুহম্মদ (স.)-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের কাহিনি বিবৃত হয়েছে।

হযরত মক্কায় ইসলামের সত্যবাণী প্রচার শুরু করলে মক্কাবাসী তাঁর এবং নবদীক্ষিত মুসলমানদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাতে থাকে। এমনকি, নিজেদের ধর্ম বিকৃত হওয়ার ভয়ে শেষ পর্যন্ত হযরতকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। তিনি তখন প্রিয় সঙ্গী হযরত আবু বকর (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে সকলের অগোচরে জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে ইয়াসরিব অভিমুখে যাত্রা করেন। ইয়াসরিববাসী হযরতকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাঁর সম্মানার্থে ইয়াসরিবের নতুন নামকরণ করেন, 'মদিনাতুন্নবি' (নবির শহর) সংক্ষেপে মদিনা।

লেখক–পরিচিতি

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ১৮৯৬ সালে খুলনা বিভাগের সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত বাঁশদহ্ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতায় কলেজে পড়ার সময় তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী', 'দি মুসলমান' প্রভৃতি পত্রিকায় কাজ করেন। তিনি কয়েকখানি গদ্য গ্রন্থ এবং অনেক নিবন্ধ রচনা করেন। চিন্তার গভীরতা এবং ভাষার পরিচ্ছন্নতা তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'স্মার্ণা নন্দিনী', 'মরুভাস্কর', 'সৈয়দ আহমদ' ইত্যাদি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ। ১৯৫৪ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দারুন নদওয়ার অধিবেশনের সভাপতি ছিল–

ক. আব্দুল ওজ্জা ইবনে কোসার খ. ইবনে ওজ্জা

গ. আবু জাহাল ঘ. আবু সুফিয়ান

২ হিজরতের সময় মহানবি তিনদিন অবস্থান করেছিলেন–

ক. জাবালেনুরে খ. উহুদ পাহাড়ে

গ. উড়োজাহাজে ঘ. গারে সওরে

৩. ‘তাহার ছিন্নমূল অন্তর আর্ত বেদনায় হাহাকার করিয়া উঠিতেছিল’– উল্লিখিত উদ্ধৃতি অংশে প্রকাশ পেয়েছে–

ক. স্বদেশের প্রতি গভীর মমত্ব বোধ
খ. পারিবারিক বন্ধন
গ. দেশ ছেড়ে যাওয়ার বেদনা
ঘ. কোনোটি নয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

হামিদপুর গ্রামে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে বয়স্করা তরুণদের নিয়ে এক জরুরি বৈঠকে বসেন। দীর্ঘ আলোচনা শেষে জীবন বাজি রেখে হলেও তরুণ-বৃদ্ধ সবাই মিলে প্রতিপক্ষকে রুখে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

৪. উদ্দীপকের তরুণ-বৃদ্ধদের মনোভাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বক্তব্য কোনটি?

ক. স্থির হইল, দারুণ-নদওয়ার বৈঠক বসিবে।
খ. যাহা করিতে হয় মক্কা বাসীরা সকলে মিলিয়া করিবে।
গ. এই বিপদ আমরা ইচ্ছা করিয়া ডাকিয়া আনিবো কেন?
ঘ. যুবকগণ স্তব্দ নীরবতায় ঊষার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

৫. উক্ত সাদৃশ্যে প্রকাশ পেয়েছে-

i. স্বাজাত্যবোধ
ii. শত্রুর প্রতি সহানুভূতি
iii. ঐক্যের গুরুত্ব

কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

যুবায়ের দাড়িয়াপুর গ্রামের হতদরিদ্র একজন শান্তিপ্রিয় কৃষক। পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত ত্রিশ শতাংশ আবাদি জমি চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করে। গ্রামের ভূমিদস্যু মাতাব্বর মহসীন সরকার তার জমি দখলের চেষ্টা করে। যুবায়ের নিজের শেষসম্বল রক্ষার জন্য প্রতিবাদী হয়ে উঠে। মাতাব্বর মহসীন সরকার মিথ্যে মামলা দিয়ে যুবায়েরকে হয়রানি করতে থাকে। যুবায়ের মামলার ভয়ে পরিবারকে নিয়ে অন্য গ্রামে থেকে চলে যায়।

ক. মদীনার পথে রচনাটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?
খ. ‘বিলম্বে শিকার হাতছাড়া হইতে পারে’ বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকে যুবায়ের এর গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে চলে যাওয়া এবং মদীনার পথে রচনার বিষয়বস্তু অভিন্ন নয়- ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শান্তিপ্রিয় ও প্রতিবাদী দিকটি কীভাবে মদীনার পথে রচনাটিতে বিদ্যমান? বিশ্লেষণ কর।

বাংলা নববর্ষ

শামসুজ্জামান খান

বাংলা সনের প্রথম মাসের নাম বৈশাখ। পয়লা বৈশাখে বাঙালির নববর্ষ উৎসব। নববর্ষ সকল দেশের, সকল জাতিরই আনন্দ উৎসবের দিন! শুধু আনন্দ উচ্ছ্বাসই না, সকল মানুষের জন্য কল্যাণ কামনারও দিন। আমরাও সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি ও কল্যাণের প্রত্যাশা নিয়েই মহাধুমধামের সঙ্গে আমাদের নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন করি। একে অন্যকে বলি, শুভ নববর্ষ।

বাংলা নববর্ষ এখন আমাদের প্রধান জাতীয় উৎসব। প্রতি বছরই এ-উৎসব বিপুল মানুষের অংশগ্রহণে বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে উঠছে। বাংলাদেশে যে এতটা প্রাণের আবেগে এবং গভীর ভালোবাসায় এ-উৎসব উদ্‌যাপিত হয় তার কারণ পাকিস্তান আমলে পূর্ব-বাংলার বাঙালিকে এ-উৎসব পালন করতে দেয়া হয়নি। বলা হয়েছে, এটা পাকিস্তানি আদর্শের পরিপন্থী। সে-বক্তব্য ছিল বাঙালির সংস্কৃতির ওপর এক চরম আঘাত। বাঙালি তার সংস্কৃতির ওপর এ আঘাত সহ্য করেনি। তারা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল বাঙালির এ-উৎসবকে জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণার দাবি জানিয়েছে। কিন্তু সে-দাবি অগ্রাহ্য হয়েছে। ফলে পূর্ব-বাংলার বাঙালি ফুঁসে উঠেছে। সোচ্চার হয়ে উঠেছে প্রতিবাদে। এভাবেই পূর্ব-বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালি জাতিসত্তা গঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় বাংলা নববর্ষ এবং তার উদ্‌যাপনের আয়োজন।

১৯৫৪ সালের পূর্ব-বাংলার সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ সরকারকে বিপুলভাবে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্টের সরকার গঠিত হলে মুখ্যমন্ত্রী ও বাঙালিদের জনপ্রিয় নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের সরকার বাংলা নববর্ষে ছুটি ঘোষণা করেন এবং দেশবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সেটা ছিল বাঙালির এক তাৎপর্যপূর্ণ বিজয়ের দিন। কিন্তু সে-বিজয় স্থায়ী হয়নি। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দিয়ে এবং সামরিক শাসন জারি করে তা সাময়িকভাবে রুখে দিয়েছে স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার। তবু পূর্ব-বাংলার বাঙালি পিছু হঠেনি। সরকারিভাবে আর নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়নি পাকিস্তান আমলে; কিন্তু বেসরকারিভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে প্রবল আগ্রহ ও গভীরতর উৎসাহ-উদ্দীপনায়। এর

মধ্যে সবচেয়ে সুসংগঠিত এবং সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানট (১৯৬১)। ১৯৬৭ সাল থেকে রমনার পাকুড়মূলে ছায়ানট নববর্ষের যে-উৎসব শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বাধাহীন পরিবেশে এখন তা জনগণের বিপুল আগ্রহ-উদ্দীপনাময় অংশগ্রহণে দেশের সর্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। রাজধানী ঢাকার নববর্ষ উৎসবের দ্বিতীয় প্রধান আকর্ষণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ছাত্র-ছাত্রীদের বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রায় মুখোশ, কার্টুনসহ যে-সব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীকধর্মী চিত্র বহন করা হয় তাতে আবহমান বাঙালিত্বের পরিচয় এবং সমকালীন সমাজ-রাজনীতির সমালোচনাও থাকে।

এবার আমরা বাংলা সন ও নববর্ষ উদ্‌যাপনের কথা বলি। বাংলা সনের ইতিহাস এখনো সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতই মনে করেন মুগল সম্রাট আকবর চান্দ্র হিজরি সনের সঙ্গে ভারতবর্ষের সৌর সনের সমন্বয় সাধন করে ১৫৫৬ সাল বা ৯৯২ হিজরিতে বাংলা সন চালু করেন। আধুনিক গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন মহামতি আকবর সর্বভারতীয় যে ইলাহি সন প্রবর্তন করেছিলেন তার ভিত্তিতেই বাংলায় আকবরের কোনো প্রতিনিধি বা মুসলমান সুলতান বা নবাব বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। সেজন্যই একে 'সন' বা 'সাল' বলে উল্লেখ করা হয়। 'সন' কথাটি আরবি, আর 'সাল' হলো ফারসি। এখনো সন বা সালই ব্যাপকভাবে চালু। তবে বঙ্গাব্দও বলেন কেউ কেউ।

বাংলা সন চালু হবার পর নববর্ষ উদ্‌যাপনে নানা আনুষ্ঠানিকতা যুক্ত হয়। নবাব এবং জমিদারেরা চালু করেন 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠান। পয়লা বৈশাখে প্রজারা নবাব বা জমিদার বাড়িতে আমন্ত্রিত হতেন, তাদের মিষ্টিমুখও করানো হতো। পান-সুপারিরও আয়োজন থাকত। তবে তার মূল উদ্দেশ্য ছিলো খাজনা আদায়। মুরশিদাবাদের নবাবেরা এ অনুষ্ঠান করতেন। বাংলার জমিদারেরাও করতেন এ অনুষ্ঠান। জমিদারি উঠে যাওয়ায় এ অনুষ্ঠান এখন লুপ্ত হয়েছে।

পয়লা বৈশাখের দ্বিতীয় বৃহৎ অনুষ্ঠান ছিল 'হালখাতা'। এ অনুষ্ঠানটি করতেন ব্যবসায়ীরা। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান। তাই ফসলের মৌসুমে ফসল বিক্রির টাকা হাতে না এলে কৃষকসহ প্রায় কেউই নগদ টাকার মুখ খুব একটা দেখতে পেত না। ফলে সারাবছর বাকিতে প্রয়োজনীয় জিনিস না কিনে তাদের উপায় ছিল না। পয়লা বৈশাখের হালখাতা অনুষ্ঠানে তারা দোকানিদের বাকির টাকা মিটিয়ে দিতেন। অন্তত আংশিক পরিশোধ করেও নতুন বছরের খাতা খুলতেন। হালখাতা উপলক্ষে দোকানিরা ঝালর কাটা লাল নীল সবুজ বেগুনি কাগজ দিয়ে দোকান সাজাতেন। ধূপধুনা জ্বালানো হতো। মিষ্টিমুখ করানো হতো গ্রাহক-খরিদ্দারদের। হাসি-ঠাট্টা, গল্পগুজবের মধ্যে বকেয়া আদায় এবং উৎসবের আনন্দ উপভোগ দুই-ই সম্পন্ন হতো। হালখাতাও এখন আর তেমন সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয় না। এখন মানুষের হাতে নগদ পয়সা আছে। বাকিতে বিকিকিনি এখন আর আগের মতো ব্যাপক আকারে হয় না।

বাংলা নববর্ষের আর একটি প্রধান অনুষ্ঠান হলো বৈশাখী মেলা। দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখের প্রথম দিনে বার্ষিক মেলা বসে। এইসব মেলার অনেকগুলোই বেশ পুরনো। এই মেলাগুলোর মধ্যে খুব প্রাচীন ঠাকুরগাঁ জেলার রানীশংকৈল উপজেলার নেকমরদের মেলা এবং চট্টগ্রামের মহামুনির বৌদ্ধপূর্ণিমা মেলা। এক সময়ে এইসব মেলা খুব ধুমধামের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হতো। সে-মেলা এখনো বসে, তবে আগের সে জৌলুস এখন আর নেই। আগে গ্রাম-বাংলার এই বার্ষিক মেলাগুলোর গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। কারণ তখনো সারাদেশে বিস্তৃত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ফলে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল স্থবির। এখন যেমন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে এক দিনের বেশি লাগে না। আগে তা সম্ভব ছিল না। নৌকা, ঘোড়ার গাড়ি, গরুর, মোষের গাড়িতে মানুষ বা পণ্য পরিবহনে বহুসময় বা কয়েকদিন লেগে যেত। এখন নতুন নতুন পাকা রাস্তা ও দ্রুতগতির যানবাহন চালু হওয়ায় সে-সমস্যা আর নেই। আগে এইসব আঞ্চলিক মেলা থেকেই মানুষ সারা বছরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে রাখত। তাছাড়া এইসব মেলা অঞ্চলবিশেষের মানুষের মিলন মেলায়ও পরিণত হতো। নানা সংবাদ আদান-প্রদান, নানা বিষয়ে মত বিনিময়েরও আদর্শ স্থান ছিল এই সব মেলা। আবার বাৎসরিক বিনোদনের জায়গাও ছিল মেলা। মেলায় থাকত কবিগান, কীর্তন, যাত্রা, গম্ভীরা গান, পুতুল নাচ, নাগরদোলাসহ নানা আনন্দ-আয়োজন।

নববর্ষের ওই তিনটি প্রধান সর্বজনীন উৎসব ছাড়াও বহু আঞ্চলিক উৎসব আছে। এদের মধ্যে চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত বলী খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯০৭ সাল থেকে কক্সবাজারসহ বৃহত্তর চট্টগ্রামের নানাস্থানে এই খেলার প্রচলন আছে। এই বিখ্যাত কুস্তি খেলাকেই বলা হয় বলী খেলা। আবদুল জব্বার নামে এক ব্যক্তি এ খেলার প্রবর্তন করেন বলে একে 'জব্বারের বলী খেলা' বলা হয়।

২০১৯

আমানিও নববর্ষের একটি প্রাচীন আঞ্চলিক মাঙ্গালিক অনুষ্ঠান। এটি প্রধানত কৃষকের পারিবারিক অনুষ্ঠান। চৈত্র মাসের শেষদিনের সন্ধ্যারাতে গৃহকর্ত্রী এক হাঁড়ি পানিতে স্বল্প পরিমাণ অপক্ব চাল ছেড়ে দিয়ে সারারাত ভিজতে দেন এবং তার মধ্যে একটি কচি আমের পাতাযুক্ত ডাল বসিয়ে রাখেন। পয়লা বৈশাখের সূর্য ওঠার আগে ঘর ঝাড়ু দিয়ে গৃহকর্ত্রী সেই হাঁড়ির পানি সারা ঘরে ছিটিয়ে দেন। পরে সেই ভেজা চাল সকলকে খেতে দিয়ে আমের ডালের কচি পাতা হাঁড়ির পানিতে ভিজিয়ে বাড়ির সকলের গায়ে ছিটিয়ে দেন। তাদের বিশ্বাস, এতে বাড়ির সকলের কল্যাণ হবে। নতুন বছর হবে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির। এ অনুষ্ঠান এখন খুব একটা দেখা যায় না।

নববর্ষের এ ধরনের আরও নানা অনুষ্ঠান আছে। তোমরা নিজ নিজ এলাকায় খোঁজ নিলে তার সন্ধান পাবে। তোমাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে নানা ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায়ও নববর্ষের উৎসব হয় নানা আনন্দময় ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্য দিয়ে এরা বৈসুব, সাংগ্রাই ও বিজু তিনটিকে একত্র করে 'বৈসাবী' নামে উৎসব করে। গ্রাম-বাংলায় নববর্ষে নানা খেলাধুলারও আয়োজন করা হতো। মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জে হতো গরুর দৌড়, হাডুডু খেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মোরগের লড়াই, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, নড়াইলে ষাঁড়ের লড়াই প্রভৃতি।

আধুনিককালের নব আঙ্গিকের বর্ষবরণ উৎসবের সূচনা হয় কোলকাতার ঠাকুর পরিবারে এবং শানিতনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে। সেই ধারা ধীরে-ধীরে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের নববর্ষ উৎসব '৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের পর নতুন গুরুত্ব ও তাৎপর্য লাভ করে। আগে সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের আয়োজনের কথা বলেছি। এছাড়া বাংলা একাডেমিতে বৈশাখী ও কারুপণ্য মেলা এবং গোটা বিশ্ববিদ্যালয় ও রমনা এলাকা পয়লা বৈশাখের দিনে লক্ষ মানুষের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে। নতুন পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ছেলেরা এবং নানা রঙের শাড়ি পরে নারীরা এই অনুষ্ঠানকে বর্ণিল করে তোলে। রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলের গান, লোকসংগীত এবং বাঁশির সুরে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে সমবেত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। আনন্দময় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ এই পরিবেশ আধুনিক বাঙালি জীবনের এক গৌরবময় বিষয়।

শব্দার্থ ও টীকা

পাকিস্তান আমল	—	১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত সময়।
ছায়ানট	—	বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান।
মঙ্গল শোভাযাত্রা	—	মানুষের মঙ্গলকামনা করে যে মিছিল করা হয়।
আবহমান	—	যা আগে ছিল এবং এখনও আছে।
পুণ্যাহ	—	পুণ্যের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠান।
হালখাতা	—	পয়লা বৈশাখে আয়োজিত অনুষ্ঠান-বিশেষ।
কবিগান	—	বাংলা গানের বিশেষ ধারা। দুজন গায়ক পালা করে একে অন্যের যুক্তি খণ্ডন করেন গানে গানে।
কীর্তন	—	গুণ-বর্ণনা, সংকীর্তন, দেব-দেবীর মহিমা বা যশ প্রচারমূলক সংগীত।
যাত্রা	—	প্রাচীন বাংলার দৃশ্যকাব্য, মঞ্চে নাট্যাভিনয়।
বৈসাবি	—	বৈসুব, সাংগ্রাই, বিজু-এর প্রথম তিনটি বর্ণের সমাহার।
ঠাকুর পরিবার	—	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার।
বিশ্ববিদ্যালয়	—	এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বুঝানো হয়েছে।

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবে। এছাড়া তারা পাহাড়িদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান সম্পর্কেও জানবে। একটি সাংস্কৃতিক আয়োজন কীভাবে বাঙালির রাজনৈতিক ঘটনাকে প্রভাবিত করেছে শিক্ষার্থীরা তাও অবগত হবে।

পাঠ-পরিচিতি

বাংলা নববর্ষ বাঙালির খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। আজকের বাংলাদেশ যে স্বাধীন হতে পেরেছে, তার পেছনে নববর্ষের প্রেরণাও সক্রিয় ছিল। কারণ পাকিস্তানিরা বাঙালির প্রাণের উৎসব নববর্ষ উদ্‌যাপনে বাধা দিয়েছিল এবং এর প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়েছিল বাঙালিরা। বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বিশেষ করে নববর্ষ উদ্‌যাপনের ইতিকথা মিশে আছে। আজও নববর্ষে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয়। নববর্ষের উৎসব বাঙালির প্রাণের উৎসবে পরিণত হয়েছে।

বাংলা সন কে, কবে প্রচলন করেছিলেন এ নিয়ে মতান্তর থাকলেও ধরে নেওয়া হয় সম্রাট আকবরের সময় এ সনের গণনা আরম্ভ হয়। পরে জমিদার ও নবাবেরা নববর্ষে পুণ্যাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। নববর্ষে হালখাতা, বৈশাখী মেলা, ঘোড়দৌড়, বিভিন্ন লোকমেলার আয়োজন করে সাধারণ মানুষ এ উৎসবকে প্রাণে ধারণ করেছে। বাঙালি গৃহিণীরাও আমানিসহ নানা ব্রত–অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বছরের প্রথম দিনটি উদ্‌যাপন করে থাকে। পাহাড়ি অবাঙালি জনগোষ্ঠীও বৈসাবি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের মতো করে তারা নববর্ষ উদ্‌যাপন করে।

সূচনার পর থেকে এই নববর্ষ পালনে নানা মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। তবে এ উৎসবকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পালন করায় সে আয়োজন দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলনের পর থেকে আমরাও নববর্ষ উৎসব ব্যাপকভাবে পালন আরম্ভ করি এবং এখন এই উৎসব বাঙালির জীবনে এক গৌরবময় অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে।

লেখক-পরিচিতি

শামসুজ্জামান খান ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর থানার চারিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পেশাগত জীবনে তিনি বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক, শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ও জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ছিলেন। তিনি ২০০৯ সালের মে মাসে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন। শামসুজ্জামান খান লেখক, গবেষক ও ফোকলোরবিদ হিসেবে দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো— প্রবন্ধগ্রন্থ : 'নানা প্রসঙ্গ', 'গণসঙ্গীত', 'মাটি থেকে মহীরুহ', 'বঙ্গাবন্ধুর সঙ্গে আলাপ ও প্রাসঙ্গিক কথকতা', 'মুক্তবুদ্ধি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমকাল', 'আধুনিক ফোকলোর চিন্তা', 'ফোকলোরচর্চা' ইত্যাদি। রম্য-রচনা : 'ঢাকাই রঙ্গরসিকতা', 'গ্রাম বাংলার রঙ্গরসিকতা' ইত্যাদি। শিশুসাহিত্য : 'দুনিয়া মাতানো বিশ্বকাপ', 'লোভী ব্রাহ্মণ ও তেনালীরাম', 'ছোটদের অভিধান' (যৌথ)।

শামসুজ্জামান খান তাঁর বিপুল কর্মজগতের স্বীকৃতিস্বরূপ অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার, কালুশাহ পুরস্কার, দীনেশচন্দ্র সেন ফোকলোর পুরস্কার, আবদুর রব চৌধুরী স্মৃতি গবেষণা পুরস্কার, দেওয়ান মোর্তজা পুরস্কার, শহীদ সোহরাওয়ার্দী জাতীয় গবেষণা পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদক লাভ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার এলাকার লোকজ সংস্কৃতির পরিচয় দাও (একক কাজ)।

খ. বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে তুমি তোমার বিদ্যালয়ে কী ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করবে সে সম্পর্কে একটি রূপরেখা তৈরি কর (একক কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলা সন চালু করা হয় কোন খ্রিষ্টাব্দে?

ক. ১৫৫৬ খ. ১৫৬১

গ. ১৯৫৪ ঘ. ১৯৬৭

২. সাল কথাটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

ক. আরবি খ. বাংলা

গ. ফারসি ঘ. উর্দু

৩. বাংলা নববর্ষ বাঙালি জাতিসত্তার সঙ্গে যুক্ত কারণ—

i. এ উৎসব আমাদের সংস্কৃতির অংশ

ii. এ সময় আমরা নতুন কাপড় পরে আনন্দ করি

iii. এটি প্রতিবাদ প্রতিরোধের মাধ্যমে অর্জিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

টুটুল টেলিভিশনে মধ্যযুগের নববর্ষের অনুষ্ঠানের কিছু অংশ দেখছিল। সেখানে দেখা যাচ্ছে ধনী-গরিব সবাই জামা কাপড় পরে জমিদার বাড়িতে দাওয়াত খেতে যাচ্ছে। সেখানে তারা খাওয়া-দাওয়া শেষে জমিদারকে খুশিমনে জমির খাজনা পরিশোধ করে ফিরে আসছে।

৪. টুটুলের দেখা অনুষ্ঠানটিকে কী বলা হয়?

ক. হালখাতা খ. পুণ্যাহ

গ. বৈসাবি ঘ. নবান্ন

৫. এ ধরনের অনুষ্ঠানের পিছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল কোনটি?

ক. অর্থনৈতিক খ. রাজনৈতিক

গ. সামাজিক ঘ. ধর্মীয়

সৃজনশীল প্রশ্ন

সীমা ও চৈতি দুই বান্ধবী। আজ তাদের খুব আনন্দের দিন, কারণ আজ নববর্ষ। তারা দুইজনে লাল পাড় সাদা শাড়ি পড়ে চলে যায় রমনার বটমূলে। সেখানে কত মানুষের ভিড়। ছেলে, মেয়ে, শিশু, বুড়ো, সবাই সেজেছে নতুন সাজে। সেখানে সীমার খালাতো বোন তন্বীর সাথে দেখা। সীমা খালা-খালু সবার খোঁজ পেল তন্বীর কাছ থেকে। ছোট খালাতো বোনের জন্য কিনে দিল নানান খেলনা। নিজের বাড়ির জন্য কিনে নিল কুলা, ঝুড়ি, হাড়ি, পাতিল ইত্যাদি। চৈতি মনের আনন্দে গেয়ে উঠল :

তাপস নিশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক॥

মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।

ক. ছায়ানট কত সাল থেকে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান শুরু করে ?

খ. হালখাতা বলতে কী বোঝায়?

গ. চৈতির গানে বাংলা নববর্ষের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? — ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের মূল সুরটিই যেন ফুটে উঠেছে।— উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

বাংলা ভাষার জন্মকথা

হুমায়ুন আজাদ

কোথা থেকে এসেছে আমাদের বাংলা ভাষা ? ভাষা কি জন্ম নেয় মানুষের মতো ? বা যেমন বীজ থেকে গাছ জন্মে তেমনভাবে জন্ম নেয় ভাষা ? না, ভাষা মানুষ বা তরুর মতো জন্ম নেয় না। বাংলা ভাষাও মানুষ বা তরুর মতো জন্ম নেয়নি, কোনো কল্পিত স্বর্গ থেকেও আসেনি। এখন আমরা যে বাংলা ভাষা বলি, এক হাজার বছর আগে তা ঠিক এমন ছিল না। এক হাজার বছর পরও ঠিক এমন থাকবে না। ভাষার ধর্মই বদলে যাওয়া। বাংলা ভাষার আগেও এদেশে ভাষা ছিল। সে ভাষায় এদেশের মানুষ কথা বলত, গান গাইত, কবিতা বানাত। মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি। রূপ বদলে যায় শব্দের, বদল ঘটে অর্থের। অনেকদিন কেটে গেলে মনে হয় ভাষাটি একটি নতুন ভাষা হয়ে উঠেছে। আর সে ভাষার বদল ঘটেই জন্ম হয়েছে বাংলা ভাষার।

আজ থেকে একশ বছর আগেও কারও কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে। কেউ জানত না কত বয়স এ ভাষার। সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয় বাংলা ভাষায়। এক দল লোক মনে করতেন ওই সংস্কৃত ভাষাই বাংলার জননী। বাংলা সংস্কৃতের মেয়ে। তবে দুষ্টু মেয়ে, যে মায়ের কথামতো চলেনি। না চলে চলে অন্য রকম হয়ে গেছে। তবে উনিশ শতকেই আরেক দল লোক ছিলেন, যাঁরা মনে করতেন বাংলার সাথে সংস্কৃতের সম্পর্ক বেশ দূরের। তাঁদের মতে, বাংলা ঠিক সংস্কৃতের কন্যা নয়। অর্থাৎ সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপত্তি ঘটেনি বাংলার। ঘটেছে অন্য কোনো ভাষা থেকে। সংস্কৃত ছিল সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষের লেখার ভাষা। তা কথ্য ছিল না। কথা বলত মানুষেরা নানা রকম 'প্রাকৃত' ভাষায়। প্রাকৃত ভাষা হচ্ছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথ্য ভাষা। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, সংস্কৃত থেকে নয়, প্রাকৃত ভাষা থেকেই উদ্ভব ঘটেছে বাংলা ভাষার।

কিন্তু নানা রকম প্রাকৃত ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে। তাহলে কোন প্রাকৃত থেকে উদ্ভব ঘটেছিল বাংলার ? এ

সম্পর্কে প্রথম স্পষ্ট মত প্রকাশ করেন জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন। বহু প্রাকৃতের একটির নাম মাগধী প্রাকৃত। তাঁর মতে মাগধী প্রাকৃতের কোনো পূর্বাঞ্চলীয় রূপ থেকে জন্ম নেয় বাংলা ভাষা। পরে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আমাদের চোখে স্পষ্ট ধরা দেয় বাংলা ভাষার ইতিহাস। যে ইতিহাস বলার জন্য আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে। পিছিয়ে যেতে হবে অন্তত কয়েক হাজার বছর।

ইউরোপ ও এশিয়ার বেশ কিছু ভাষার ধ্বনিতে, শব্দে লক্ষ করা যায় গভীর মিল। এ ভাষাগুলো যে সব অঞ্চলে ছিল ও এখন আছে, তার সবচেয়ে পশ্চিমে ইউরোপ আর সবচেয়ে পূর্বে ভারত ও বাংলাদেশ। ভাষাতাত্ত্বিকেরা এ ভাষাগুলোকে একটি ভাষাবংশের সদস্য বলে মনে করেন। ওই ভাষাবংশটির নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ বা ভারতী-ইউরোপীয় ভাষাবংশ। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশে আছে অনেকগুলো ভাষা-শাখা, যার একটি হচ্ছে ভারতীয় আর্যভাষা। ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন ভাষাগুলোকে বলা হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন রূপ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলোতে। এগুলো সম্ভবত লিখিত হয়েছিল যিশুখ্রিস্টের জন্মেরও এক হাজার বছর আগে, অর্থাৎ ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। বেদের শ্লোকগুলো পবিত্র বিবেচনা করে তার অনুসারীরা সেগুলো মুখস্থ করে রাখত। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে যেতে থাকে। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা ব্যবহার করত বদলে যেতে থাকে সে ভাষা। এক সময় সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে বেদের ভাষা বা বৈদিক ভাষা। তখন ব্যাকরণবিদরা নানা নিয়ম বিধিবন্ধ করে একটি মানসম্পন্ন ভাষা সৃষ্টি করেন। এই ভাষার নাম 'সংস্কৃত', অর্থাৎ বিধিবন্ধ, পরিশীলিত, শুদ্ধ ভাষা। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের আগেই এ ভাষা বিধিবন্ধ হয়েছিল।

যিশুর জন্মের আগেই পাওয়া যায় ভারতীয় আর্য-ভাষার তিনটি স্তর। প্রথম স্তরটির নাম বৈদিক বা বৈদিক সংস্কৃত। খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দ এ ভাষার কাল। তারপর পাওয়া যায় সংস্কৃত। খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দের দিকে এটি সম্ভবত বিধিবন্ধ হতে থাকে এবং খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের দিকে ব্যাকরণবিদ পাণিনির হাতেই এটি চূড়ান্তভাবে বিধিবন্ধ হয়। বৈদিক ও সংস্কৃতকে বলা হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। প্রাকৃত ভাষাগুলোকে বলা হয় মধ্যভারতীয় আর্যভাষা। মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ ভাষাগুলো কথ্য ও লিখিত ভাষারূপে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত থাকে। এ প্রাকৃত ভাষাগুলোর শেষ স্তরের নাম অপভ্রংশ অর্থাৎ যা খুব বিকৃত হয়ে গেছে। বিভিন্ন অপভ্রংশ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে নানান আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা- বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, পাঞ্জাবি প্রভৃতি ভাষা।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, পূর্ব মাগধী অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে বাংলা; আর আসামি ও ওড়িয়া ভাষা। তাই বাংলার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আসামি ও ওড়িয়ার। আর কয়েকটি ভাষার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা রয়েছে বাংলার সঙ্গে; কেননা সেগুলোও জন্মেছিল মাগধী অপভ্রংশের অন্য দুটি শাখা থেকে। ওই ভাষাগুলো হচ্ছে মৈথিলি, মাগধি, ভোজপুরিয়া। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে অবশ্য একটু ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি একটি প্রাকৃতের নাম বলেন গৌড়ী প্রাকৃত। তিনি মনে করেন, গৌড়ী প্রাকৃতেরই পরিণত অবস্থা গৌড়ী অপভ্রংশ থেকে উৎপত্তি ঘটে বাংলা ভাষার।

শব্দার্থ ও টীকা

তরু	–	বৃক্ষ, গাছ।
ভাষাতাত্ত্বিক	–	ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করেন।
শতাব্দী	–	একশ বছর।
শ্লোক	–	সংস্কৃত ভাষায় রচিত দুই চরণে অন্ত্যমিলযুক্ত এবং প্রায়শই চার লাইনে বিভক্ত কবিতা বা কবিতাংশ।
দুর্বোধ্য	–	যা বোঝা কঠিন, সহজে বোঝা যায় না এমন।
বিধিবন্ধ	–	নিয়ম দ্বারা শাসিত, নিয়মের অধীন।
ঘনিষ্ঠ	–	নিকট, নিবিড়, খুব কাছের।
উদ্ভূত	–	উৎপন্ন, জাত।
উৎপত্তি	–	সূচনা, শুরু, জন্ম।
উদ্ভব	–	সূচনা, জন্ম, অভ্যুদয়, উৎপত্তি।

২০১৬

পাঠের উদ্দেশ্য

রচনাটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষার জন্মকথা জানতে পারবে। বাংলা ভাষা যে সাধারণ মানুষের কথ্যভাষা সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে এবং মাতৃভাষা বাংলার প্রতি তাদের মমত্ববোধ জাগবে।

পাঠ-পরিচিতি

'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধটি হুমায়ুন আজাদের 'কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী' গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে লেখক বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ভাষার ধর্মই হচ্ছে বদলে যাওয়া। মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি। শব্দেরও বদল ঘটে এবং সে সঙ্গে শব্দের অর্থেরও। এক সময় ধারণা করা হতো বাংলা এসেছে সংস্কৃত থেকে। তখনকার দিনে সংস্কৃত ছিল উচুঁ শ্রেণির মানুষের লেখার ভাষা। সাধারণ মানুষ কথা বলত প্রাকৃত ভাষায় আর এ প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের একটি শাখা হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা।

এ প্রাকৃত ভাষাগুলোর বিকৃত রূপ হচ্ছে অপভ্রংশ। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, পূর্ব-মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে গৌড়ী প্রাকৃতের পরিবর্তিত রূপ গৌড়ী অপভ্রংশ। গৌড়ী অপভ্রংশ থেকেই জন্ম নিয়েছে বাংলা ভাষা।

লেখক-পরিচিতি

হুমায়ুন আজাদ ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার রাড়িখাল গ্রামে। একজন কৃতী ছাত্র হিসেবে তিনি তাঁর শিক্ষাজীবন শেষ করেন। কর্মজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন গবেষক হিসেবে তিনি খ্যাতি পেয়েছেন। তাঁর গবেষণাগ্রন্থ হচ্ছে 'শামসুর রাহমান : নিঃসঙ্গ শেরপা', 'বাক্যতত্ত্ব' ইত্যাদি। কিশোর পাঠকদের জন্য লেখা দুটি গ্রন্থ 'লালনীল দীপাবলি', 'কতো নদী সরোবর'। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'অলৌকিক ইস্টিমার' ও 'জ্বলো চিতাবাঘ' উল্লেখযোগ্য। তিনি সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। হুমায়ুন আজাদ ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানির মিউনিখ শহরে মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. বাংলা ভাষার জন্মকথা নিয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে হুমায়ুন আজাদ রচিত 'কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী' শীর্ষক গ্রন্থটি সংগ্রহ করতে পারলে ভালো হয়।)

খ. তোমার এলাকার আঞ্চলিক শব্দগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিশিক্ষকের নিকট জমা দাও (একক কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অনেকেই কোন ভাষাকে বাংলার জননী মনে করত ?

ক. হিন্দি খ. গুজরাটি

গ. সংস্কৃত ঘ. মারাঠি

২. কোনটি উঁচু শ্রেণির মানুষের লেখার ভাষা ছিল ?

ক. বাংলা খ. সংস্কৃত

গ. প্রাকৃত ঘ. মৈথিলি

৩. প্রাকৃত ভাষা বলতে বোঝায়—

ক. গণমানুষ সচরাচর যে ভাষায় কথা বলে

খ. শিক্ষিত জনগণ যে ভাষায় কথা বলে

গ. অঞ্চল বিশেষের মানুষ যে ভাষায় কথা বলে

ঘ. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা যে ভাষায় কথা বলে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পৃথিবীতে ২৬টি ভাষাবংশ আছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশে আবার অনেকগুলো ভাষা রয়েছে। যার একটি ইন্দো-ইরানীয় ভাষা। এই ইন্দো-ইরানীয় শ্রেণির দুইটি প্রধান ভাগ—ইরানীয় ও ভারতীয় আর্য। বাংলা ভারতীয় আর্য ভাষারই বংশধর।

৪. আর্য ভাষার বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরটির নাম কি?

ক. বৈদিক খ. সংস্কৃত

গ. প্রাকৃত ঘ. অপভ্রংশ

৫. উল্লিখিত বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরটির সম্পর্কে সঠিক তথ্য হলো–

i. এটি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথ্য ভাষা

ii. এই স্তরের বিবর্তিত রূপই হচ্ছে বাংলা ভাষা

iii. খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ অব্দ পর্যন্ত এ ভাষার কাল

কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

ইফতি পিয়া অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। একদিন বাংলা ব্যাকরণে ভাষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পড়ার সময় দুটো বৈশিষ্ট্যের দিকে ওর নজর আটকে গেল। বৈশিষ্ট্য দুটি হলো—

(১) ভাষা যত কঠিন শব্দ দিয়েই শুরু হোক না কেন, ক্রমান্বয়ে ব্যবহারের ফলে তা সহজ ও সরল হয়ে ওঠে। যেমন-চক্র > চক্ক > চাকা, চর্মকার > চম্মআর > চামার, হস্ত > হত্থ > হাত ইত্যাদি। একসময় এরকম সরলীকরণ হতে হতে একটি নতুন ভাষারই উদ্ভব হয়।

(২) কালের পরিক্রমায় একটি ভাষা স্থানিক ও কালিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধারণ করে বহুরূপী হয়ে ওঠে। যেমন— ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে সারা পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় সাড়ে তিন হাজারের মতো ভাষা ছড়িয়ে পড়েছে। ইফতি পিয়া ভাবতে থাকে।

ক. 'সংস্কৃত' শব্দের অর্থ কী ?

খ. একদল লোক বাংলাকে 'সংস্কৃতের মেয়ে' মনে করত কেন ?

গ. অনুচ্ছেদের ১. নং বৈশিষ্ট্যটির মধ্য দিয়ে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ইফতি পিয়া পঠিত ২. নং বৈশিষ্ট্যটি 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

কবিতা

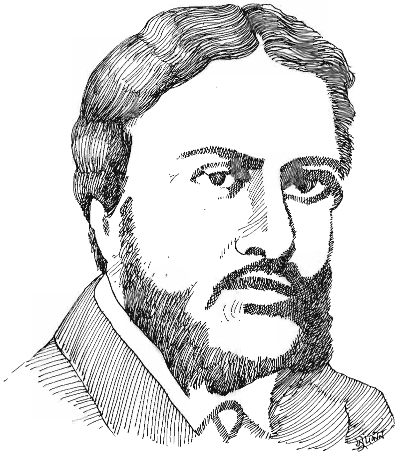

বঙ্গভূমির প্রতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে।
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন;
কিন্তু কোন গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে!
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুন ধর
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কী বসনত, কী শরদে!

শব্দার্থ ও টীকা

মিনতি	— বিনীত প্রার্থনা।
পরমাদ	— প্রমাদ; ভুল-ভ্রান্তি।
কোকনদ	— লাল পদ্ম।
নীর	— পানি; জল।
শমন	— মৃত্যুর দেবতা।
মক্ষিকা	— মাছি।
শ্যামা জন্মদে	— শ্যামল জন্মভূমি অর্থে।
বর	— আশীর্বাদ।
মানস	— মন।
তামরস	— পদ্ম।
শরদে	— শরৎ কাল বোঝাতে।

পাঠের উদ্দেশ্য

এই কবিতা পাঠের মাধ্যমে স্বদেশের প্রতি শিক্ষার্থীর মনে শ্রদ্ধা ও বিনয়ভাব জেগে উঠবে। বিদেশের ঐশ্বর্য ও জৌলুস সত্ত্বেও নিজ দেশের প্রতি মনের গভীরে আগ্রহবোধ সৃষ্টি হবে।

পাঠ-পরিচিতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত কয়েকটি গীতিকবিতার একটি 'বঙ্গভূমির প্রতি'। এ কবিতায় স্বদেশের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দেশকে কবি মা হিসেবে কল্পনা করে নিজেকে ভেবেছেন তার সন্তান। প্রবাসী মধুসূদন ভেবেছেন—মা যেমন সন্তানের কোনো দোষ মনে রাখেন না, দেশমাতৃকাও তাঁর সব দোষ ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্য তিনি বিনয়ের সঙ্গে এও বলেছেন যে, তাঁর এমন কোনো মহৎ গুণ নেই, যে-কারণে তিনি স্মরণীয় হতে পারেন। বিনয়ী কবি তাই দেশমাতৃকার কাছে এই বলে প্রণতি জানাচ্ছেন, তিনি যেন দেশমাতৃকার স্মৃতিতে পদ্মফুলের মতো ফুটে থাকেন।

কবি-পরিচিতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রথাবিরোধী লেখক। তিনি মহাকাব্য, গীতিকাব্য, সনেট, পত্রকাব্য, নাটক, প্রহসন ইত্যাদি রচনা করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। শৈশব থেকে তাঁর মনে কবি হওয়ার তীব্র বাসনা ছিল। তিনি মনে করেছিলেন, বিলেত না গেলে কবি হওয়া যাবে না। বিলেতে গেলে সুবিধা হবে—এ আশায় তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর নামের আগে 'মাইকেল' শব্দটি যুক্ত হয়। পরে তিনি সত্য উপলব্ধি করতে পারেন এবং বাংলায় সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। বাংলা, ইংরেজি ছাড়াও তিনি হিব্রু, ফরাসি, জার্মান, ইটালিয়ান, তামিল, তেলেগু ইত্যাদি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করেন। তাঁর রচিত প্রহসন : 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'; নাটক : 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী'; পত্রকাব্য : 'বীরাঙ্গনা' ইত্যাদি। 'চতুর্দশপদী কবিতা' নামে বাংলা সনেটের রচয়িতাও তিনি। এই মহান সাহিত্যস্রষ্টা ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে যশোরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম–অনুশীলন

ক. 'বঙ্গভূমির প্রতি' শীর্ষক কবিতাটি নিয়ে আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে। শুদ্ধ উচ্চারণ, উচ্চারণে স্পষ্টতা, শ্রবণযোগ্যতা, বোধগম্যতা, আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ ইত্যাদি বিবেচনায় রাখতে হবে।)

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'মক্ষিকা'র সমার্থক শব্দ কোনটি?

ক. মৌমাছি খ. মাছি
গ. বোলতা ঘ. ফড়িং

২. নরকুলে ধন্য কে?

ক. ক্ষমতাবান ব্যক্তি খ. দীর্ঘজীবী মানুষ
গ. যিনি কীর্তিমান ঘ. মন্দিরের সেবক

নিচের কবিতাংশ পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক. ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম– যেন এই দেশেতে মরি।

খ. বাংলার হাওয়া বাংলার জল
হৃদয় আমার করে সুশীতল।

৩. কবিতাংশে 'বঙ্গভূমির প্রতি'– কবিতার কোন চরণটির ভাব প্রকাশ পেয়েছে?

ক. অমর করিয়া বর, দেহ দাসে, সুবরদে !
খ. রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
গ. চিরস্থির করে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?
ঘ. তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুন ধর

৪. **'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটির মতো দ্বিতীয় (খ) কবিতাংশেও প্রকাশ পেয়েছে**

i. স্বদেশের প্রতি অনুরাগ
ii. স্বদেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ
iii. প্রশান্তি

কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে— এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়— হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;

২. মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য করে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই !

ক. বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মহাকাব্যের নাম কী?
খ. কবি বর প্রার্থনা করেন কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের প্রথম কবিতাংশের আলোকে 'ফুটি যেন স্মৃতি-জলে' চরণটির ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "দ্বিতীয় কবিতাংশ ও 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার মূল সুর একই"– তুমি কি একমত? যুক্তিসহ উত্তর দাও।

দুই বিঘা জমি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবই গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।
কহিলাম আমি, তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই।
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো-জোর মরিবার মতো ঠাঁই।
শুনি রাজা কহে, বাপু, জানো তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা—
ওটা দিতে হবে। কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজল চক্ষে, করুন রক্ষে গরিবের ভিটেখানি।
সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, আচ্ছা, সে দেখা যাবে।

২০১৬

পরে মাস দেড়ে ভিটে মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রি, সকলই বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি—
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু বিঘার পরিবর্তে।
সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য!
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে সেই দুই বিঘা জমি।
হাটে মাঠে বাটে এই মতো কাটে বছর পনেরো-ষোলো—
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়োই বাসনা হল।
নমো নমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ,
স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল—নিশীথশীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে—
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।
দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে—
কুমোরের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি রথতলা করি বামে,
রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে।
ধিক ধিক ওরে, শত ধিক তোরে, নিলাজ কুলটা ভূমি!
যখনি যাহার তখনি তাহার, এই কী জননী তুমি!
সে কি মনে হবে একদিন যবে ছিলে দরিদ্রমাতা
আঁচল ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া ফল ফুল শাক পাতা!
আজ কোন রীতে কারে ভুলাইতে ধরেছ বিলাসবেশ—
পাঁচরঙা পাতা অঞ্চলে গাঁথা, পুষ্পে খচিত কেশ!
আমি তোর লাগি ফিরেছি বিবাগি গৃহহারা সুখহীন—

তুই হেথা বসি ওরে রাক্ষসী, হাসিয়া কাটাস দিন।
ধনীর আদরে গরব না ধরে! এতই হয়েছ ভিন্ন
কোনোখানে লেশ নাহি অবশেষ সেদিনের কোনো চিহ্ন!
কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি, ক্ষুধাহরা সুধারাশি!
যত হাসো আজ যত করো সাজ ছিলে দেবী, হলে দাসী।
বিদীর্ণহিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারি দিকে চেয়ে দেখি—
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে, সেই আমগাছ, এ কি!
বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালককালের কথা।
সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিকো ঘুম,
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা পলায়ন—
ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন!
সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে,
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।
ভাবিলাম মনে বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা,
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা।
হেনকালে হায় যমদূত প্রায় কোথা হতে এল মালি,
ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।
কহিলাম তবে, আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব—
দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব!
চিনিল না মোরে, নিয়ে গেল ধরে কাঁধে তুলি লাঠিগাছ
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ সাথে ধরিতে ছিলেন মাছ।
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, মারিয়া করিব খুন।
বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ।
আমি কহিলাম, শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয়!
বাবু কহে হেসে বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।
আমি শুনে হাসি আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে—
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ,   আমি আজ চোর বটে!

শব্দার্থ ও টীকা

বিঘে — বিঘা শব্দের চলিত রূপ। জমির পরিমাপ বিশেষ। কুড়ি কাঠা বা ১৪৪০০ বর্গফুট বা ১৩৩৪ বর্গমিটার পরিমাণ জমি।

ভূস্বামী — অনেক জমির মালিক, জমিদার।

দিঘে — দৈর্ঘ্যে, লম্বা দিকের মাপে।

পাণি — হাত।

বক্ষে জুড়িয়া পাণি — বুকে জোড় হাত রেখে অনুনয় করে।

সপ্ত পুরুষ — পূর্ববর্তী সাত বংশধর বা প্রজন্ম।

লক্ষ্মীছাড়া — লক্ষ্মী ছেড়েছে এমন, দুর্ভাগা, ভাগ্যহীন।

ক্রুর — নিষ্ঠুর, নির্দয়।

ডিক্রি — আদালতের হুকুম বা নির্দেশনামা।

খত — ঋণপত্র, ঋণের দলিল।

ভূরি ভূরি — প্রচুর।

কাঙাল — নিঃস্ব, দরিদ্র।

মোহগর্ত — মোহের ক্ষুদ্র গহ্বর।

বিশ্বনিখিল — গোটা দুনিয়া, সমগ্র পৃথিবী।

হেরিলাম — দেখলাম।

ধাম — তীর্থস্থান।

ভূধর — পর্বত, পাহাড়।

নমো নমো নম — নমস্কার, বন্দনাজ্ঞাপক অভিব্যক্তি বিশেষ।

সমীর — বাতাস, বায়ু।

ললাট — কপাল।

খেলাগেহ — খেলাঘর।

নিশীথ — গভীর রাত।

নিশীথ শীতল স্নেহ — হৃদয়জুড়ানো গভীর মমতা।

প্রহর — তিন ঘণ্টা কাল, দিনরাত্রির আট ভাগের এক ভাগ।

গোলা — শস্য রাখার মরাই বা আড়ত।

তৃষাতুর — পিপাসা বা তৃষ্ণায় কাতর।

পঁহুছিনু — পৌঁছে গেলাম।

লভিল — লাভ করল, পেল।

উড়ে — ভারতের উড়িষ্যা বা ওড়িয়া প্রদেশের লোক।

কলবর — কোলাহল, হট্টগোল, হৈচৈ।

পারিষদ — মোসাহেব, পার্শ্বচর।

ঘটে — মাথার মগজে, এখানে ভাগ্যে অর্থে ব্যবহৃত।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা শোষকশ্রেণির নিষ্ঠুর শোষণ ও গরিবদের দুর্দশা সম্পর্কে জানতে পারবে। গরিবদের প্রতি তারা সহানুভূতিশীল হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'দুই বিঘা জমি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রা কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। দরিদ্র কৃষক উপেন অভাব-অনটনে বন্ধক দিয়ে তাঁর প্রায় সব জমি হারিয়েছে। বাকি ছিল মাত্র দুই বিঘা জমি। কিন্তু জমিদার তাঁর বাগান বাড়ানোর জন্য সে জমির দখল নিতে চায়। কিন্তু সাত পুরুষের স্মৃতি বিজড়িত সে জমি উপেন দিতে না চাইলে জমিদারের ক্রোধের শিকার হয় সে। মিথ্যে মামলা দিয়ে জমিদার সে জমি দখল করে নেয়। ভিটেছাড়া হয়ে উপেন বাধ্য হয় পথে বেরুতে। সাধু হয়ে সে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘোরে। কিন্তু পৈতৃক ভিটের স্মৃতি সে ভুলতে পারে না।

একদিন চির-পরিচিত গ্রামে সে ফিরে আসে। গ্রামের অন্য সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও তার ভিটে আজ নিশ্চিহ্ন। কিন্তু হঠাৎ সে লক্ষ করে তার ছোট বেলার স্মৃতি-বিজড়িত সেই আম গাছটি এখনও আছে। সেই আম গাছের ছায়াতলে বসে ক্লান্ত-শ্রান্ত উপেন পরম শান্তি অনুভব করে। তার মনে পড়ে, ঝড়ের দিনে কত না আম সে কুড়িয়েছে এখানে। হঠাৎ বাতাসের ঝাপটায় দুটি পাকা আম পড়ে তার কোলের কাছে। আম দুটিকে সে জননীর স্নেহের দান মনে করে গ্রহণ করে। কিন্তু তখনই ছুটে আসে মালি। উপেনকে সে আম-চোর বলে গালাগালি করতে থাকে। উপেনকে জমিদারের নিকট হাজির করা হয়। উপেন জমিদারের কাছে আমটি ভিক্ষা হিসেবে চাইলে জমিদার তাকে সাধুবেশী চোর বলে মিথ্যা অপবাদ দেয়।

এই কবিতার মাধ্যমে কবি দেখাতে চেয়েছেন, সমাজে এক শ্রেণির লুটেরা বিত্তবান প্রবল প্রতাপ নিয়ে বাস করে। তারা সাধারণ মানুষের সম্পদ লুট করে সম্পদশালী হয়। তারা অর্থ, শক্তি ও দাপটের জোরে অন্যায়কে ন্যায়, ন্যায়কে অন্যায় বলে প্রতিষ্ঠা করে। 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটিতে কবি এদের স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

কবি-পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি, বিশ্বনন্দিত কবি। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে তাঁর জন্ম ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে, ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ। ছেলেবেলায় বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা পড়াশোনায় তাঁর মন বসে নি। পড়াশোনার জন্য তাঁকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি—এসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু পাঠ শেষ করার আগেই তিনি সেসব ছেড়ে দেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর কবি-প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। সাহিত্যের সকল শাখায় অসামান্য দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। কবিতা, সংগীত, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, রম্যরচনা ইত্যাদি সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর পদচারণা ছিল স্বচ্ছন্দ, উজ্জ্বল। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, গীতিকার, সুরকার, শিক্ষাবিদ, চিত্রশিল্পী, নাট্য-প্রযোজক ও অভিনেতা। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজিতে অনূদিত 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য তিনি এশীয়দের মধ্যে প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আমাদের জাতীয় সংগীত আমার 'সোনার বাংলা' তাঁরই লেখা। রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. কবিতাটি তোমার নিজস্ব ভাষায় গল্পে, নাটিকায় বা বর্ণনাধর্মী গদ্যে রূপায়িত কর।

খ. তোমার জানা কোনো কৃষকের অত্যাচারিত জীবনের একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ কর (একক কাজ)।

গ. কবিতাটির নাট্যরূপ দাও এবং শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'দুই বিঘা জমি' কোন ধরনের কবিতা ?

ক. কাহিনী-কবিতা খ. গীতিকবিতা

গ. চতুর্দশপদী কবিতা ঘ. স্বদেশপ্রেমের কবিতা

২. 'সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিকো ঘুম'—পঙ্‌ক্তিটিতে যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে তা হলো—

i. স্মৃতিকাতরতা

ii. স্পর্শকাতরতা

iii. অনুদারতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

৩. বাবু সাহেবের সম্পত্তি-আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে যে চরণে, তা হচ্ছে–

i. বাবু কহিলেন, বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে

ii. পেলে দুই বিঘে, প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা

iii. এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রাজিব সাহেব এক যুগ আগে আমেরিকায় গিয়ে প্রচুর বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়েছেন। কিন্তু তারপরও তার মনে সুখ নেই। সেখানকার পরিবেশ, প্রকৃতি, মানুষজন কোনোকিছুই তাকে আকৃষ্ট করে না। সারাক্ষণ মনটা পড়ে থাকে আঁকা-বাঁকা মেঠো পথের ধারের কুঁড়েঘরে, যেখানে কেটেছে তার শৈশব, কৈশোরের সোনালি সময়।

৪. উদ্দীপকে রাজিব সাহেবের মানসিকতায় 'দুই বিঘা জমি' কবিতার কোন অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে ?

ক. স্বদেশপ্রীতি খ. প্রকৃতিপ্রীতি

গ. স্বজাত্যপ্রীতি ঘ. মর্ত্যপ্রীতি

৫. উক্ত অনুভূতি নিচের কোন চরণে ফুটে উঠেছে ?

ক. চেয়ে দেখো মোর আছে বড়-জোর মরিবার মতো ঠাঁই।

খ. কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য।

গ. কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি ক্ষুধাহরা সুধারাশি।

ঘ. তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারিনে, সেই দুই বিঘা জমি।

সৃজনশীল প্রশ্ন

গাজীপুর চৌরাস্তার কাছে মতিন মিয়ার ছোট্ট এক চায়ের দোকান। আর দোকানের পাশেই 'ক' হাউজিং সোসাইটির বিশালাকার অ্যাপার্টমেন্ট গড়ে উঠেছে। একদিন সকালে মতিন দেখে, তার দোকান অ্যাপার্টমেন্টের সীমানা প্রাচীরের মধ্যে আটকে গেছে। সে বুঝে গেল আর কিছুই করার নেই। উপায়ান্তর না দেখে সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ফ্লাস্কে করে চা বিক্রি করে সংসার চালায় আর উদাস দৃষ্টিতে গগনচুম্বি অট্টালিকাগুলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খ্রিষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান?

খ. 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি'—বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. 'ক' হাউজিং সোসাইটির কার্যক্রমে 'দুই বিঘা জমি' কবিতার বাবু সাহেব চরিত্রের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তার বর্ণনা দাও।

ঘ. উদ্দীপকের মতিন 'দুই বিঘা জমির' শোষিত উপেনের সার্থক প্রতিনিধি কি না— এ বিষয়ে তোমার মতামত যুক্তি সহকারে উপস্থাপন কর।

পাছে লোকে কিছু বলে

কামিনী রায়

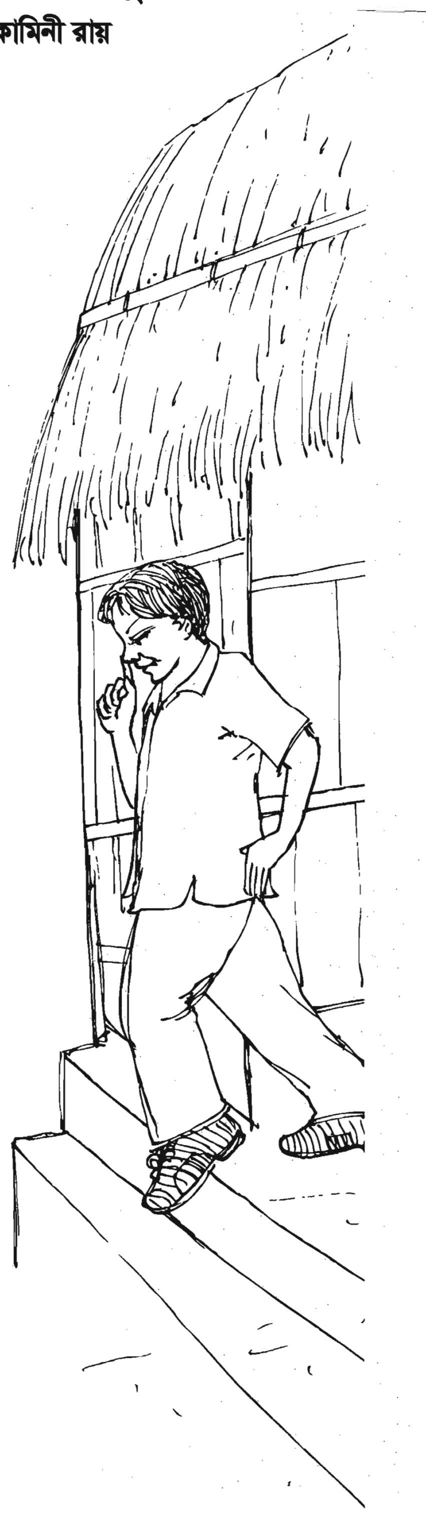

করিতে পারি না কাজ,
সদা ভয়, সদা লাজ
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

আড়ালে আড়ালে থাকি,
নীরবে আপনা ঢাকি,
সম্মুখে চরণ নাহি চলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

হৃদয়ে বুদবুদ মতো,
উঠে শুভ্র চিন্তা কত,
মিশে যায় হৃদয়ের তলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

কাঁদে প্রাণ যবে, আঁখি
সযতনে শুষ্ক রাখি
নিরমল নয়নের জলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

একটি স্নেহের কথা
প্রশমিতে পারে ব্যথা
চলে যাই উপেক্ষার ছলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

মহৎ উদ্দেশ্যে যবে
এক সাথে মিলে সবে
পারি না মিলিতে সেই দলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

বিধাতা দিছেন প্রাণ
থাকি সদা ম্রিয়মাণ
শক্তি মরে ভীতির কবলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

শব্দার্থ ও টীকা

সদা	— সবসময়।
সংশয়	— সন্দেহ, দ্বিধা।
সংকল্প	— মনের দৃঢ় ইচ্ছা।
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে	— মনের দৃঢ় ইচ্ছা পুরণ করায় বাধা তৈরি হয়।
শুভ্র	— সাদা, এখানে পরিষ্কার বা অমলিন অর্থে ব্যবহৃত।
যবে	— যখন।
প্রশমিতে	— উপশম ঘটাতে, নিবারণ করতে।
প্রশমিতে পারে ব্যথা	— যন্ত্রণার উপশম ঘটাতে পারে।
উপেক্ষা	— গ্রাহ্য না করা, অবহেলা করা, গুরুত্ব না দেয়া।
ছল	— ছুতা, ওজর।
ম্রিয়মাণ	— কাতর, বিষাদগ্রস্ত।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা নিঃসংকোচ চিত্তে জীবনপথে পরিচালিত হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করবে। কে কী বলল তা ভেবে নিজেকে গুটিয়ে রাখার প্রবণতা থেকে তারা মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে।

পাঠ-পরিচিতি

কোনো কাজ করতে গেলে কেউ কেউ অনেক সময় দ্বিধাগ্রস্ত হয়। কে কী মনে করবে, কে কী সমালোচনা করবে এই ভেবে তারা বসে থাকে। এর ফলে কাজ এগোয় না। যাঁরা সমাজে অবদান রাখতে চান তাঁদের দ্বিধা করলে চলবে না। দৃঢ় মনোবল নিয়ে লোকলজ্জা ও সমালোচনাকে উপেক্ষা করতে হবে। মানুষের কল্যাণে মহৎ কাজ করতে হলে ভয়-ভীতি সংকোচ উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে হবে।

কবি-পরিচিতি

কামিনী রায় বরিশালের বাসন্ডা গ্রামে ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৬ সালে কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি. এ. পাস করে তিনি ওই কলেজেই অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। কামিনী রায়ের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্ট। আনন্দ-বেদনার সহজ-সরল প্রকাশে তাঁর কবিতা তাৎপর্য অর্জন করেছে। তাঁর লেখা ছোটদের কবিতা সংগ্রহের নাম 'গুঞ্জন'। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল– আলো ও ছায়া, মাল্য ও নির্মাল্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। ১৯৩৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

কর্ম-অনুশীলন

ক. 'পাছে লোকে কিছু বলে' শীর্ষক কবিতার বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে তোমার কিংবা তোমার পরিচিত লোকজনের সমস্যা নিয়ে গল্প, নাটিকা বা প্রবন্ধ রচনা কর (একক কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মহৎ কাজ সম্পাদনে কোনটিকে উপেক্ষা করা অনুচিত ?

ক. সংকোচ খ. সংশয়

গ. সংকল্প ঘ. বাধা

২. আর্তের পাশে দাঁড়াতে গিয়েও কেউ কেউ কেন উপেক্ষা করে চলে যান ?

ক. রোগাক্রান্ত হওয়ার ভয়ে খ. সমালোচনার ভয়ে

গ. সহযোগিতার ভয়ে ঘ. ছোট হওয়ার ভয়ে

৩. 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতাটি পাঠকের মধ্যে কোন ধরনের অনুপ্রেরণা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ?

ক. ভয়হীনতা খ. পরোপকারিতা

গ. সাহসিকতা ঘ. সংকোচহীনতা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মাসুদ গ্রামের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে। সে ভাবে এক সময় প্রচুর আয় হবে, বেকাররা স্বনির্ভর হবে। কিন্তু যদি সে এ কাজে সফল হতে না পারে, তাহলে তার সমালোচনা করবে। তাই সে তার পরিকল্পনা বাদ দেয়।

৪. উদ্দীপকের মাসুদের মাঝে 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার কোন বিশেষ দিকটি প্রকাশিত হয়েছে ?

ক. ভীরুতা খ. সংশয়

গ. হতাশা ঘ. দুর্বলতা

৫. কামিনী রায়ের দৃষ্টিতেই মাসুদের এ উদ্যোগ সফল করা যেতে পারে—

i. দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলে

ii. সকল সংশয় দূর করলে

iii. সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ‘আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।’

২. ‘নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো
যুগ-জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরের আলো।
সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে
নিন্দুক সে ছায়ার মতো থাকবে পাছে পাছে।
নিন্দুক সে বেঁচে থাকুক বিশ্বহিতের তরে,
আমার আশা পূর্ণ হবে তাহার কৃপা ভরে।’

[সংক্ষেপিত]

ক. ‘প্রশমিতে’– শব্দটির অর্থ কী?

খ. ‘সংশয়ে সংকল্প সদা টলে’– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের প্রথম অংশের বক্তব্য ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার কোন স্তবকের বিপরীত ভাব ধারণ করেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশের নিন্দুক ও ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার নিন্দুকের তুলনামূলক আলোচনা কর।

প্রার্থনা

কায়কোবাদ

বিভো, দেহ হৃদে বল!
না জানি ভকতি, নাহি জানি স্তুতি,
কি দিয়া করিব, তোমার আরতি
আমি নিঃসম্বল!
তোমার দুয়ারে আজি রিক্ত করে
দাঁড়ায়েছি প্রভো, সঁপিতে তোমারে
শুধু আঁখি জল,
দেহ হৃদে বল!

বিভো, দেহ হৃদে বল!
দারিদ্র্য পেষণে, বিপদের ক্রোড়ে,
অথবা সম্পদে, সুখের সাগরে
ভুলি নি তোমারে এক পল,
জীবনে মরণে, শয়নে স্বপনে
তুমি মোর পথের সম্বল;
দেহ হৃদে বল!

বিভো, দেহ হৃদে বল!
কত জাতি পাখি, নিকুঞ্জ বিতানে
সদা আত্মহারা তব গুণগানে,
আনন্দে বিহ্বল!
ভুলিতে তোমারে, প্রাণে অবসাদ
তরুলতা শিরে, তোমারি প্রসাদ ’
চারু ফুল ফল!
দেহ হৃদে বল!

বিভো, দেহ হৃদে বল!
তোমারি নিঃশ্বাস বসন্তের বায়ু,
তব স্নেহ কণা জগতের আয়ু,
তব নামে অশেষ মঙ্গল!
গভীর বিষাদে, বিপদের ক্রোড়ে,
একাগ্র হৃদয়ে স্মরিলে তোমারে
নিভে শোকানল!
দেহ হৃদে বল!

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

প্রার্থনা	–	মুনাজাত, আবেদন।
বিভো	–	বিভু, স্রষ্টা, এখানে ‘বিভো’ বলে কবি স্রষ্টাকে সম্বোধন করেছেন।
রিক্ত করে	–	শূন্য হাতে।
পেষণে	–	অত্যাচারে।
ক্রোড়	–	কোল।
পল	–	মুহূর্তকাল, নিমেষ।
অশেষ	–	যার শেষ নেই, অন্তহীন।
বিষাদ	–	বিষণ্ণতা, দুঃখবোধ।
স্মরিলে	–	স্মরণ করলে, মনে করলে।
প্রসাদ	–	অনুগ্রহ।
হৃদে	–	হৃদয়ে, মনে।
বল	–	শক্তি, জোর।
স্তুতি	–	প্রশংসা।
আরতি	–	প্রার্থনা।
চারু	–	সুন্দর।
নিকুঞ্জ	–	বাগান।
শোকানল	–	শোকরূপ অনল, যে শোক হৃদয়কে দগ্ধ করে।

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা স্রষ্টার মহিমা সম্পর্কে জানবে এবং তাদের মনে ধর্মবোধ জাগবে। তারা স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং সৎ ও সুন্দর জীবন গঠনে তৎপর হবে।

পাঠ-পরিচিতি

‘প্রার্থনা’ কবিতাটি কবির ‘অশ্রুমালা’ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। কবি এ কবিতায় স্রষ্টার অপার মহিমার কথা বর্ণনা করে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়েছেন। কবি ভক্তি বা প্রশংসা করতে না জেনেও কেবল চোখের জলে নিজেকে নিবেদন করেন। বিপদে, আপদে, সুখে, শান্তিতে সব সময় তিনি বিধাতার কাছ থেকে শক্তি কামনা করেন। গাছে গাছে পাখি, বনে বনে ফুল সবই বিধাতাকে স্মরণ করে। তাঁর অফুরন্ত দয়ায় জগতের সব কিছু চলছে। তাঁর কাছেই সকলে সাহায্য প্রার্থনা করে। তাঁর অপার করুণা লাভ করেই বিশ্ব সংসারের প্রতিটি জীব ও উদ্ভিদ প্রাণধারণ করে আছে। তাঁর দয়া ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও চলতে পারি না। সুখে–দুখে, শয়নে– স্বপনে তিনি আমাদের একমাত্র ভরসা। আমরা রিক্ত হস্তে পরম ভক্তি ভরে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই : হে প্রভু, আমাদের দেহে ও হৃদয়ে শক্তি দাও। আমরা যেন তোমার আরাধনায় নিজেকে নিবেদন করতে পারি।

কবি-পরিচিতি

কায়কোবাদ ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী। প্রবেশিকা পর্যন্ত লেখাপড়া করে তিনি ডাক বিভাগে চাকরি নেন। অনেক দিন ধরে তিনি নিজগ্রাম আগলাতেই পোস্টমাস্টারের দায়িত্ব পালন করেন। ছেলেবেলা থেকেই কবিতা লেখায় তাঁর হাতেখড়ি হয়। তারপর আপন স্বভাবে তিনি ক্রমাগত লিখে গেছেন। তাঁর রচিত 'মহাশ্মশান' বিখ্যাত মহাকাব্য। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'অশ্রুমালা', 'শিবমন্দির', 'অমিয়ধারা', 'মহররম শরীফ' ইত্যাদি।
১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে কবি কায়কোবাদ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কবি বিধাতাকে কী বলে স্তুতি জানিয়েছেন?

ক. পথের সম্বল　　খ. চারু ফুল ফল

গ. দেহে হৃদে বল　　ঘ. অশেষ মঙ্গল

২। কোন শব্দটি শুদ্ধ?

ক. দরিদ্র্য　　খ. দারিদ্র্য

গ. দারিদ্র্যতা　　ঘ. দারিদ্রতা

৩। 'নিকুঞ্জ' শব্দটির অর্থ কী?

ক. কুঞ্জলতা　　খ. ফুলদল

গ. বাগান　　ঘ. মঞ্জরি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নম্রশিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে,
দুখের রাতে নিখিল ধরা
যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়।

ক. স্তুতি কথার অর্থ কী?

খ. 'তোমার দুয়ারে আজি রিক্ত করে' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'প্রার্থনা' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি 'প্রার্থনা' কবিতার একটি বিশেষ দিককে নির্দেশ করলেও সমগ্রভাব প্রকাশে সক্ষম নয় — যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ২০১৬

বাবুরের মহত্ত্ব

কালিদাস রায়

পাঠান-বাদশা লোদি
পানিপথে হত। দখল করিয়া দিল্লির শাহিগদি,
দেখিল বাবুর এ-জয় তাঁহার ফাঁকি,
ভারত যাদের তাদেরি জিনিতে এখানো রয়েছে বাকি।
গর্জিয়া উঠিল সংগ্রাম সিং, 'জিনেছ মুসলমান,
জয়ী বলিব না এ দেহে রহিতে প্রাণ।
লয়ে লুণ্ঠিত ধন
দেশে ফিরে যাও, নতুবা মুঘল, রাজপুতে দাও রণ।'
খানুয়ার প্রান্তরে
সেই সিংহেরো পতন হইল বীর বাবুরের করে।
এ বিজয় তার স্বপ্ন-অতীত, যেন বা দৈব বলে
সারা উত্তর ভারত আসিল বিজয়ীর করতলে।
কবরে শায়িত কৃতঘ্ন দৌলত,
বাবুরের আর নাই কোনো প্রতিরোধ।
দস্যুর মতো তুষ্ট না হয়ে লুণ্ঠিত সম্পদে,
জাঁকিয়া বসেছে মুঘল সিংহ দিল্লির মসনদে।
মাটির দখলই খাঁটি জয় নয় বুঝেছে বিজয়ী বীর,
বিজিতের হৃদি দখল করিবে এখন করেছে স্থির।
প্রজারঞ্জনে বাবুর দিয়াছে মন,
হিন্দুর-হৃদি জিনিবার লাগি করিতেছে সুশাসন,
ধরিয়া ছদ্মবেশ
ঘুরি পথে পথে খুঁজিয়ে প্রজার কোথায় দুঃখ ক্লেশ।
চিতোরের এক তরুণ যোদ্ধা রণবীর চৌহান
করিতেছে আজি বাবুরের সন্ধান,
কুর্তার তলে কৃপান লুকায়ে ঘুরিছে সে পথে পথে
দেখা যদি তার পায় আজি কোনো মতে
লইবে তাহার প্রাণ,
শোণিতে তাহার ক্ষালিত করিবে চিতোরের অপমান।
দাঁড়ায়ে যুবক দিল্লির পথ-পাশে
লক্ষ করিছে জনতার মাঝে কেবা যায় কেবা আসে।
হেন কালে এক মত্ত হস্তী ছুটিল পথের পরে
পথ ছাড়ি সবে পলাইয়া গেল ডরে।
সকলেই গেল সরি
কেবল একটি শিশু রাজপথে রহিল ধুলায় পড়ি।

হাতির পায়ের চাপে
'গেল গেল' বলি হায় হায় করি পথিকেরা ভয়ে কাঁপে।
'কুড়াইয়া আন ওরে'
সকলেই বলে অথচ কেহ না আগায় সাহস করে।
সহসা একটি বিদেশি পুরুষ ভিড় ঠেলে যায় ছুটে,
'কর কী কর কী' বলিয়া জনতা চিৎকার করি উঠে।
করি-শুণ্ডের ঘর্ষণ দেহে সহি
পথের শিশুরে কুড়ায়ে বক্ষে বহি
ফিরিয়া আসিল বীর।
চারি পাশে তার জমিল লোকের ভিড়।
বলিয়া উঠিল এক জন 'আরে এ যে মেথরের ছেলে,
ইহার জন্য বে-আকুফ তুমি তাজা প্রাণ দিতে গেলে?
খুদার দয়ায় পেয়েছ নিজের জান,
ফেলে দিয়ে ওরে এখন করগে স্নান।'
শিশুর জননী ছেলে ফিরে পেয়ে বুকে
বক্ষে চাপিয়া চুমা দেয় তার মুখে।

বিদেশি পুরুষে রাজপুত বীর চিনিল নিকটে এসে,
এ যে বাদশাহ স্বয়ং বাবুর পর্যটকের বেশে।
ভাবিতে লাগিল, 'হরিতে ইহারই প্রাণ
পথে পথে আমি করিতেছি সন্ধান?
বাবুরের পায়ে পড়ি সে তখন লুটে
কহিল সঁপিয়া গুপ্ত কৃপাণ বাবুরের করপুটে,-
'জাঁহাপনা, এই ছুরিখানা দিয়ে আপনার প্রাণবধ
করিতে আসিয়া একি দেখিলাম! ভারতের রাজপদ
সাজে আপনারে, অন্য কারেও নয়।
বীরভোগ্যা এ বসুধা এ কথা সবাই কয়,
ভারত-ভূমির যোগ্য পালক যেবা,
তাহারে ছাড়িয়া, এ ভূমি অন্য কাহারে করিবে সেবা?
কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘোর,
সঁপিনু জীবন, করুন এখন দণ্ডবিধান মোর।'
রাজপথ হতে উঠায়ে যুবকটিরে
কহিল বাবুর ধীরে,
'বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেওয়ার চেয়ে;
জান না কি ভাই? ধন্য হলাম আজিকে তোমারে পেয়ে
আজি হতে মোর শরীর রক্ষী হও;
প্রাণ-রক্ষকই হইলে আমার, প্রাণের ঘাতক নও।'

শব্দার্থ ও টীকা

হত	–	নিহত।
শাহিগদি	–	বাদশাহ্গণ যে আসনে বসে শাসনকার্য পরিচালনা করেন; সিংহাসন।
জিনিতে	–	জয় করতে।
রণ	–	যুদ্ধ।
প্রান্তর	–	বিস্তৃত মাঠ, ময়দান।
স্বপ্ন–অতীত	–	স্বপ্নের অতীত, যা স্বপ্নেও দেখা যায় না, অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয়।
করতল	–	হাতের তালু।
প্রতিরোধ	–	বাধা।
তুষ্ট	–	তৃপ্ত , আনন্দিত, খুশি।
মসনদ	–	সিংহাসন, রাজাসন।
করি–শুণ্ড	–	হাতির শুঁড়।
বে–আকুফ	–	নির্বোধ।
পর্যটক	–	ভ্রমণকারী।
গুপ্ত কৃপাণ	–	লুকানো তলোয়ার।
বসুধা	–	পৃথিবী।
ঘাতক	–	হত্যাকারী।
দণ্ডবিধান	–	শাস্তি প্রদান

বাবুর- ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট। তাঁর আসল নাম জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ। তবে তিনি 'বাবুর' বা 'সিংহ' নামেই সমধিক পরিচিতি। তিনি মাত্র ১১ বছর বয়সে মধ্য-এশিয়ার সমরখন্দের সিংহাসনে আরোহন করেন এবং অল্প বয়সেই দু'বার সিংহাসন হারান। তারপর তিনি নিজ দেশ ছেড়ে আফগানিস্তানের সিংহাসন অধিকার করেন এবং পরে ভারতের ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে দিল্লি অধিকার করেন। মেবারের রাজা সংগ্রাম সিংহকে তিনি পরাজিত করেন। এভাবে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

পাঠান বাদশা লোদি- ভারতের লোদি বংশীয় শেষ পাঠান-সম্রাট সুলতান ইব্রাহিম লোদি।

পানিপথ- দিল্লীর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র। এখানে তিনটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

সংগ্রাম সিংহ- রাজপুতানার অন্তর্গত মেবার রাজ্যের অধিপতি রাজা সংগ্রাম সিংহ। তিনি খানুয়ার প্রান্তরে বাবুরের কাছে পরাজিত হন।

খানুয়ার প্রান্তর– আগ্রার পশ্চিমে অবস্থিত যুদ্ধক্ষেত্র।

কৃতঘ্ন দৌলত– বাবুরের ভারত আক্রমণকালে দৌলত খাঁ লোদি পাঞ্জাবের শাসক ছিলেন। তিনি নিজের দুশমন ইব্রাহিম লোদির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বাবুরকে ভারত আক্রমণের জন্য আহবান করেন। পরে তিনি বাবুরের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

চিতোর- রাজপুতনার মেবার রাজ্যের রাজধানী

রণবীর চৌহান- রাজপুত জাতির একটি প্রাচীন শাখার নাম চৌহান। যে স্বদেশপ্রেমিক রাজপুত যুবক বাবুরকে হত্যা করতে চেয়েছিল তাকে বলা হয়েছে 'রণবীর চৌহান'।

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পাঠ করার মাধ্যমে সম্রাট বাবুরের মহানুভবতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবহিত হবে। তারা মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতাটি কালিদাস রায়ের 'পর্ণপুট' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। এ কবিতায় মুঘলসম্রাট বাবুরের মহানুভবতা বর্ণিত হয়েছে। এতে তাঁর মহৎ আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধকে তুলে ধরা হয়েছে। ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবুর। রাজ্য বিজয়ের পর তিনি প্রজাসাধারণের হৃদয়জয়ে মনোযোগী হলেন। রাজপুতগণ তাঁকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। রাজপুত-বীর তরুণ রণবীর চৌহান বাবুরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে দিল্লির রাজপথে ঘুরছিল। এমন সময় বাবুর নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে মত্ত হাতির কবল থেকে রাজপথে পড়ে-থাকা একটি মেথর শিশুকে উদ্ধার করেন। রাজপুত যুবক বাবুরের মহত্ত্বে বিস্মিত হয়। সে বাবুরের পায়ে পড়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করে। মহৎপ্রাণ বাবুর তাকে ক্ষমা করেন এবং তাকে নিজের দেহরক্ষী নিয়োগ করেন।

কবি পরিচিতি

কালিদাস রায় পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকতাকে তিনি আদর্শ পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্য সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি বিচিত্র বিষয়ের ওপর কবিতা লিখেছেন। তিনি বেশ কিছুসংখ্যক কাহিনী-কবিতা রচনা করেন। তিনি তাঁর কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের সার্থক প্রয়োগ করেছেন। কবি হিসেবে স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'কবিশেখর' উপাধিতে ভূষিত হন। কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট. উপাধি প্রদান করে। কালিদাস রায়ের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম : 'কিশলয়', 'পর্ণপুট', 'বল্লরী', 'ঋতুমঙ্গল', 'ক্ষুদকুঁড়া', 'রসকদম্ব', 'বৈকালী', 'পূর্ণাহুতি' ইত্যাদি। তিনি ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতাটি কালিদাস রায়ের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

ক. কিশলয় খ. পর্ণপুট

গ. ঋতুমঙ্গল ঘ. বৈকালী

২. 'জয়ী বলিব না এ দেহে রহিতে প্রাণ।' কে এই প্রতিজ্ঞা করেছিল?

ক. চৌহান খ. সংগ্রাম সিং

গ. দৌলত খাঁ ঘ. ইব্রাহিম লোদি

৩. 'বীরভোগ্যা এ বসুধা'-এ কথার অর্থ কী?

ক. বীরপুরুষেরাই এ পৃথিবীতে মর্যাদা পেয়ে থাকেন

খ. বীরপুরুষগণই পৃথিবীতে কীর্তি স্থাপন করে থাকেন

গ. বীরগণ পৃথিবীকে বেশি ভোগ করেন

ঘ. এ পৃথিবীতে বীরের অধিকারই স্বীকৃত

৪. বাবুরের মহত্ত্ব কবিতায় ফুটে উঠেছে বাবুরের-

i. ক্ষমাশীলতা

ii. বীরত্ব

iii. মহানুভবতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. iii ঘ i, ii ও iii

নিচের চরণ দুটো পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘোর,
সঁপিনু জীবন, করুন এখন দণ্ডবিধান মোর।'

৫. কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘোর, কার প্রতিহিংসার ঘোর কেটেছে?

ক. চৌহানের খ. সংগ্রাম সিং-এর

গ. দৌলত খাঁ-এর ঘ. ইব্রাহিম লোদির

৬. 'করুন এখন দণ্ডবিধান মোর'- কিসের দণ্ডবিধানের কথা এখানে বল হয়েছে?

i. প্রতিহিংসার

ii. অন্ধ মোহের

iii. অপরাধের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. প্রচণ্ড বন্যায় ডুবে যায় টাঙ্গাইলের ব্যাপক অঞ্চল। অনেকেরই ঘরবাড়ি ডুবে যায়। নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে অগণিত মানুষ। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এমনি একটা পরিবার নৌকায় চড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে। তীব্র স্রোতের টানে নৌকাটি উল্টে গেলে সবাই সাঁতার কেটে উঠে এলেও জলে ডুবে যায় একটি শিশু। বড় মিয়া নামের এক যুবক এ দৃশ্য দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে উদ্ধার করেন শিশুটিকে। কুলে উঠে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। ডাক্তার এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানালেন বড় মিয়া আর বেঁচে নেই।

ক. রনবীর চৌহান কে ছিলেন?

খ. বড়ই কঠিন জীবন দেয়া যে জীবন নেয়ার চেয়ে। কেন?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বড় মিয়া আবরণে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় ফুটে ওঠা দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটিতে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার একটা বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটলেও সমভাব ধারণ করে না – যুক্তিসহ বুঝিয়ে লিখ।

২. "বাঁচিতে চাই না আর
জীবন আমার সঁপিলাম, পীর, পুত পদে আপনার।
ইব্রাহীমের গুপ্ত ঘাতক আমি ছাড়া কেউ নয়,
ঐ অসিখানা এ বুকে হানুন সত্যের হোক জয়।"

ক. বাবুর–এর আসল নাম কী?

খ. 'বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেয়ার চেয়ে' – কেন?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ইব্রাহীমের গুপ্তঘাতকের সাথে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় বর্ণিত রাজপুত বীরের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার সমগ্র ভাব প্রকাশে কতটুকু সক্ষম তা যুক্তি সহকারে বুঝিয়ে বল।

২০১৯

নারী

কাজী নজরুল ইসলাম

সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান
মাতা ভগ্নি ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোনো কালে একা হয় নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী।

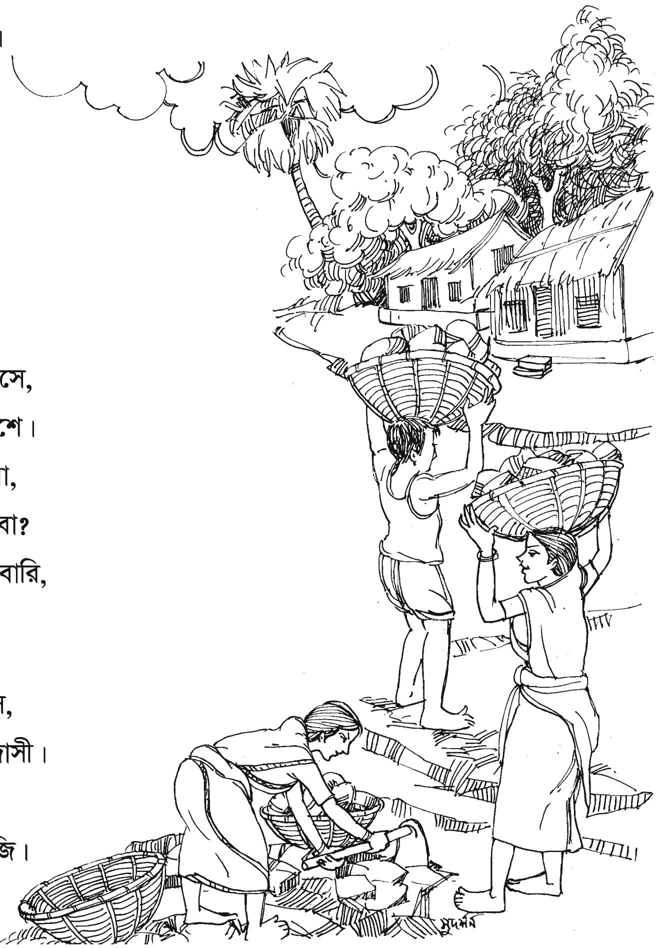

সে-যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল নাকো, নারীরা আছিল দাসী।
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি।
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পরযুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে।
যুগের ধর্ম এই—
পীড়ন করিলে সে-পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই!

[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

সাম্য	— সমতা, সকলের জন্যে সম অধিকার।
মহীয়ান	— সুমহান, এখানে মহিমান্বিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
রণ	— যুদ্ধ, লড়াই।
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর	— অসংখ্য নারী স্বামীকে হারিয়েছে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি	— হৃদয়ভরা মমতা দিয়ে উৎসাহিত করল নারী।
বিজয়-লক্ষ্মী নারী	— জয়ের নিয়ন্তা দেবী হিসেবে নারীকে কল্পনা করা হয়েছে।
ডঙ্কা	— জয়ঢাক।
রচা	— রচনা করা হয়েছে এমন, সৃষ্টি করা হয়েছে এমন।
পীড়ন	— অত্যাচার, নির্যাতন, শারীরিক কষ্ট প্রদান।
পীড়া	— যন্ত্রণা, কষ্ট, বেদনা।

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। মানব সভ্যতায় নারীর অবদান যে পুরুষের চেয়ে কম নয় তা জেনে নারীর অধিকারের প্রতি সচেতন হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'নারী' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। সাম্যবাদী কবি 'নর-নারী' উভয়কেই মানুষ হিসেবে দেখেন। তিনি জগতে নর ও নারীর সাম্য বা সমান অধিকারে আস্থাবান। তাঁর মতে, পৃথিবীতে মানবসভ্যতা নির্মাণে নারী ও পুরুষের অবদান সমান। কিন্তু ইতিহাসে পুরুষের অবদান যতটা লেখা হয়েছে নারীর অবদান ততটা লেখা হয় নি। কিন্তু এখন দিন এসেছে সম অধিকারের। তাই নারীর ওপর নির্যাতন চলবে না, তাঁর অধিকারকে ক্ষুণ্ন করা চলবে না। নারী-পুরুষ সবাইকে সুন্দর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করতে হবে সম্মিলিতভাবে।

কবি-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করতে পারেন নি। দশম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে তিনি স্কুল ছেড়ে বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন। যুদ্ধ শেষ হলে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয়। নজরুল কলকাতায় ফিরে এসে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হলে চারদিকে সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কবিতায় পরাধীনতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উচ্চারিত হয়েছে। অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি প্রবল প্রতিবাদ করেন। এজন্য তাঁকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। তাঁর রচনাবলি অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কবিতা, সংগীত, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও গল্প—সাহিত্যের সকল শাখায় আমরা তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল পরিচয় পেয়ে থাকি। তিনি সাম্যবাদী চেতনাভিত্তিক কবিতা, শ্যামাসংগীত, ইসলামি গান ও গজল লিখে প্রশংসা পেয়েছেন। তিনি আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারে কুশলতা দেখিয়েছেন। দুর্ভাগ্য যে, মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁর সাহিত্যসাধনায় ছেদ ঘটে। ১৯৭২ সালে কবিকে সপরিবারে বাংলাদেশে আনা হয়। ১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ও একুশে পদক পান। তিনি আমাদের জাতীয় কবি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে, কাব্যগ্রন্থ : 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'চক্রবাক'; উপন্যাস : 'মৃত্যুক্ষুধা', 'কুহেলিকা'; গল্পগ্রন্থ : 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন' 'শিউলিমালা' ; প্রবন্ধগ্রন্থ : 'যুগবাণী', 'রুদ্র-মঙ্গল' ; নাটক : 'ঝিলিমিলি', 'আলেয়া', 'মধুমালা' ইত্যাদি। কবি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম–অনুশীলন

ক. তোমার পরিচিতজনদের মধ্যে এমন কোনো নারীর জীবনালেখ্য রচনা কর— যার কর্মজগৎ নিয়ে তুমি গর্ব করতে পার (একক কাজ)।

খ. নারী-পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদের স্বরূপ চিহ্নিত করার জন্য তোমার সহপাঠীদের মধ্যে একটি গবেষণা চালাতে পার। এর জন্য শিক্ষকের সহযোগিতায় প্রথমেই প্রশ্নমালা তৈরি করতে হবে। যেমন— ১.সংসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কে? উত্তর হতে পারে নারী, পুরুষ, অথবা উভয়ই।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে মৃত্যুবরণ করেন ?

ক. ১৯১৯ খ. ১৯৭২

গ. ১৯৭৫ ঘ. ১৯৭৬

২. বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে কোনটি লেখা নেই?

ক. বোনের সেবা খ. নারীর সিঁথির সিঁদুর

গ. ভগ্নির আত্মত্যাগ ঘ. বধূদের আত্মত্যাগ

৩. ‘পীড়ন করিলে সে-পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই’—চরণটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রবাদবাক্য—

i. ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়

ii. যেমন কর্ম তেমন ফল

iii. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

লোকশিল্পী কাঙালিনী সুফিয়া জীবিকার তাগিদে কোদাল-টুকরি নিয়ে পুরুষ শ্রমিকদের সাথে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাটি কাটেন। দিন শেষে মজুরি নিতে গিয়ে দেখেন পুরুষ শ্রমিকদের দেওয়া হচ্ছে দু-শ টাকা আর তাকে দেওয়া হলো একশ টাকা। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে মালিক বলে— এটাই নিয়ম!

৪. প্রদত্ত উদ্দীপকটির সাথে 'নারী' কবিতার ভাবগত ঐক্যের দিকটি হলো—

i. বৈষম্য

ii. শোষণ

iii. সাম্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii	খ. i ও iii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

৫. উদ্দীপকের ভাব নিচের কোন চরণে প্রকাশ পেয়েছে ?

ক. অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর

খ. কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে

গ. বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি

ঘ. কোন কালে একা হয় নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নারীদের প্রেরণাদায়ক একটি নাম আনোয়ারা। একজন নারী হয়ে জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্বাচন-সংক্রান্ত কাজ করেছেন। সম্প্রতি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মতো বিশাল কর্মযজ্ঞ তিনি কৃতিত্বের সাথে সমাপ্ত করেছেন। রিটার্নিং অফিসার হিসেবে তিনি অন্য পুরুষ সহকর্মীদের কাছ থেকে যথাযথ সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছেন। নারী বলে কোথাও তাকে সমস্যায় পড়তে হয় নি।

ক. 'নারী' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত ?

খ. কবি বর্তমান সময়কে 'বেদনার যুগ' বলতে কী বুঝিয়েছেন ?

গ. আনোয়ারার কার্যক্রমে 'নারী' কবিতার যে দিকটি উদ্ভাসিত হয়েছে তার বর্ণনা দাও।

ঘ. উদ্দীপকে কবি কাজী নজরুল ইসলামের অনুভূতির প্রতিফলন ঘটলেও 'নারী' কবিতায় কবি আরও বেশি বাঙ্ময়— বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

২. জনৈক সমালোচকের মতে— ব্রিটিশ ভারতে বঙ্গীয় মুসলমান নারীসমাজ ছিল অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধের নিগড়ে আবদ্ধ। নিরক্ষরতা, অশিক্ষা ও সামাজিক ভেদ-বুদ্ধিও ছিল তাদের জন্য নিয়তির মতো সত্য। অবরুদ্ধ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত এক অসহায় জীবে তারা পরিণত হয়েছিলেন। এদেরকে আলোর জগতে আনার জন্য রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর বক্তব্য— 'আমরা সমাজেরই অর্ধাঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কীভাবে ? কোন এক পা বাধিয়া রাখিলে সে খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে— একই।'

ক. 'বিজয়-লক্ষ্মী নারী'– অর্থ কী ?

খ. 'সাম্যের গান' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন ?

গ. জনৈক সমালোচকের মতটি 'নারী' কবিতার কোন দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ—ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বেগম রোকেয়ার বক্তব্য যেন কাজী নজরুল ইসলামের 'নারী' কবিতারই প্রতিধ্বনি—উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ২০১৬

আবার আসিব ফিরে

জীবনানন্দ দাশ

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে— এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়— হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হবো— কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমির গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়;— রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে—

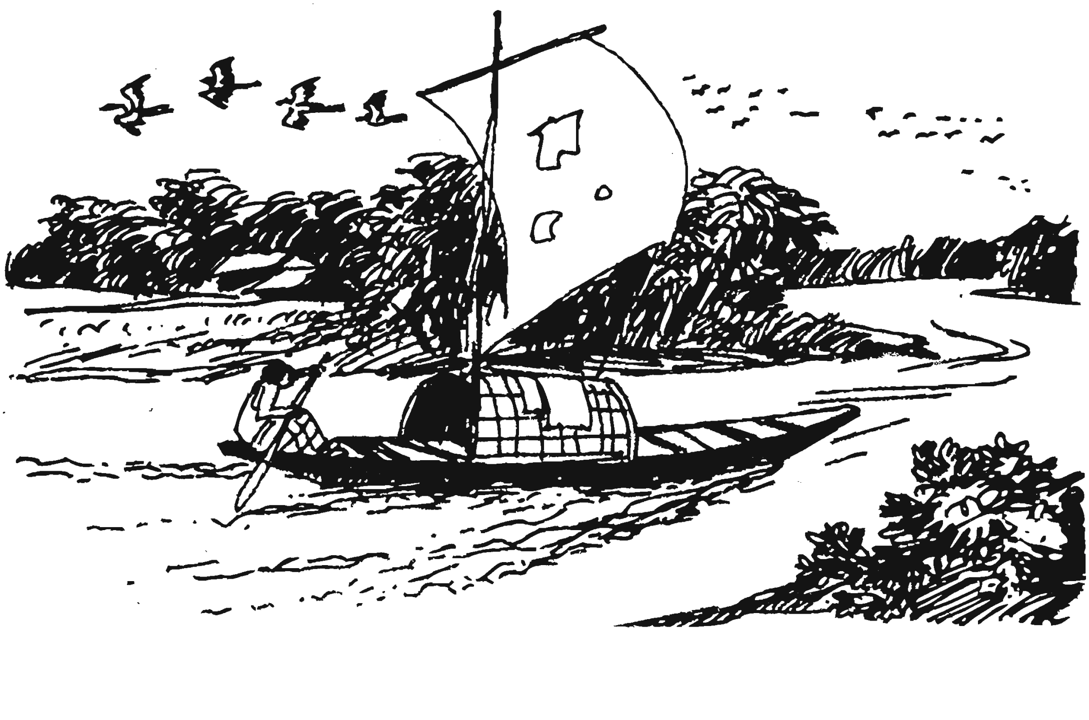

শব্দার্থ ও টীকা

ধানসিঁড়ি	— ঝালকাঠি জেলায় ধানসিঁড়ি নামে একটি নদী ছিল। এখন নদীটি মরে গেছে। কবি তাঁর কবিতায় এ নদীটির নাম ব্যবহার করেছেন।
শঙ্খচিল	— এক ধরনের সাদা চিল।
নবান্ন	— নতুন ধানকাটার পর আমাদের দেশে এ উৎসব হয়। এ উৎসবে দুধ, গুড়, নারকেলের সঙ্গে মিশিয়ে নতুন আতপ চালের ভাত খাওয়া হয়।
কার্তিকের নবান্নের দেশে	— কবি নিজের জন্মভূমি বাংলাদেশকে নবান্নের দেশ বলেছেন। নবান্ন অর্থ নতুন ভাত। কার্তিক মাসে ঘরে নতুন ধান তুলে কৃষকেরা নবান্ন উৎসবে মেতে ওঠে।
ঘুঙুর	— নূপুর, পায়ের অলংকার।
জলাঙ্গী	— কবি এখানে নদীকে জলাঙ্গী (অর্থাৎ জল যার অঙ্গে) নামে অভিহিত করেছেন। নদীমাতৃক বাংলাদেশকে কবি জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলা বলেছেন।
ডাঙা	— শুকনো জায়গা, স্থলভূমি।
সুদর্শন	— এক ধরনের গুবরে পোকা ।
লক্ষ্মীপেঁচা	— সুলক্ষণযুক্ত পেঁচা।
রূপসা	— খুলনা শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত একটি নদীর নাম। এ নামে ঝালকাঠি জেলায়ও একটি ছোট নদী আছে।
ডিঙা	— ছোট নৌকা।
নীড়ে	— পাখির বাসায়।
ধবল	— সাদা।

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা বাংলার প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবে। তাদের মনে নিজের দেশের প্রতি মমত্ববোধের জাগরণ ঘটবে।

পাঠ-পরিচিতি

'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটি কবির 'রূপসী বাংলা' কাব্য থেকে নেয়া হয়েছে। কবি এ কবিতায় দেখিয়েছেন যে, তিনি নিজের দেশকে খুবই ভালোবাসেন। প্রিয় জন্মভূমির অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিসগুলো তাঁর দৃষ্টিতে সুন্দর হয়ে ধরা পড়েছে। কবি মনে করেন, যখন তাঁর মৃত্যু হবে তখন দেশের সঙ্গে তাঁর মমতার বাঁধন শেষ হবে না। তিনি বাংলার নদী, মাঠ, ফসলের খেতকে ভালোবেসে শঙ্খচিল বা শালিকের বেশে এদেশে ফিরে আসবেন। আবার কখনও বা ভোরের কাক হয়ে কুয়াশায় মিশে যাবেন। এমনও হতে পারে, তিনি হাঁস হয়ে সারাদিন কলমির গন্ধে ভরা বিলের পানিতে ভেসে বেড়াবেন। এমনকি দিনের শেষে যে সাদা বকের দল মেঘের কোল ঘেঁষে নীড়ে ফিরে আসে তাদের মাঝেও কবিকে খুঁজে পাওয়া যাবে। এভাবে তিনি বাংলাদেশের রূপময় প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাবেন।

কবি-পরিচিতি

কবি জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে তাঁর কর্মজীবনের শুরু হয় এবং তিনি বিভিন্ন সময়ে কলকাতা সিটি কলেজ, দিল্লি রামযশ কলেজ, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ, খড়্গপুর কলেজ, বরিষা কলেজ ও হাওড়া কলেজে অধ্যাপনা করেন। এক সময় তিনি সাংবাদিকতার পেশাও অবলম্বন করেছিলেন। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতির রং ও রূপের বৈচিত্র্য প্রকাশ ঘটেছে। অনেক অজানা গাছ, পশু-পাখি ও লতাপাতা তাঁর কবিতায় নতুন পরিচয়ে ধরা পড়েছে। প্রকৃতিপ্রেমিক এই কবি প্রকৃতি থেকেই তাঁর কবিতার রূপরস সংগ্রহ করেছেন। কবিতা ছাড়াও তিনি গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি ১৯৫৪ সালে কলকাতায় এক ট্রাম দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন।

২০১৫

কর্ম–অনুশীলন

ক. কবিতাটির দৃশ্যচিত্র অবলম্বনে একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশ গ্রহণে)।

খ. 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটি অবলম্বনে একক ও দলগত আবৃত্তির আয়োজন কর।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ধানসিঁড়ি কিসের নাম ?

ক. নদীর খ. শহরের

গ. ধানের ঘ. গ্রামের

২. 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে ?

ক. ধূসর পাণ্ডুলিপি খ. রূপসী বাংলা

গ. ঝরাপালক ঘ. বনলতা সেন

৩. 'সারাদিন কেটে যাবে কলমির গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে'—এখানে সারাদিন কেটে যাবে কার ?

ক. হাঁসের খ. কিশোরীর

গ. কাকের ঘ. কবির

কবিতাংশটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

'গোধূলি লগনে জগদীশে স্মরণে
বিদায় লইব জনমের তরে
লুকাইব আমি সন্ধ্যার আঁধারে বাংলা মায়ের ক্রোড়ে॥'

৪. উদ্দীপকে 'আবার আসিব ফিরে' কবিতার কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে ?

ক. স্বদেশচেতনা খ. মৃত্যুচেতনা

গ. প্রকৃতিচেতনা ঘ. ধর্মচেতনা

৫. উক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি উদ্ভাসিত হয়েছে নিচের কোন চরণে ?

i. আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়

ii. হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে

iii. আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পল্লির সন্তান অমিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষার্থে ফ্রান্স যায়। সেখানকার সুপ্রশস্ত রাজপথ, উদ্যান, নির্মল প্রকৃতি তার খুব ভালো লাগে। রাস্তাঘাট, রেলস্টেশন, বাস-স্টপেজ সব জায়গায় দেশি-বিদেশি স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গের মূর্তি স্থাপনের মাধ্যমে ফরাসিদের দেশপ্রেম দেখে সে বিস্মিত হয়। ওদের ক্যাফে, মিউজিয়াম সবকিছুই তাকে আকৃষ্ট করে। উচ্চশিক্ষা শেষ করে অমিত স্থায়িভাবে সেখানে থেকে যায়। তার অতীত স্মৃতি ফরাসি সৌন্দর্যের মোহে ক্রমশ ধূসর হয়ে যায়।

ক. উঠানে খইয়ের ধান ছড়ায় কে ?

খ. মানুষ না হয়ে শঙ্খচিল, শালিকের বেশে জীবনানন্দ দাশ এদেশে ফিরতে চান কেন ?

গ. 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় উদ্দীপকের ফরাসি জাতির কোন দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে ? বর্ণনা কর।

ঘ. অমিতের অনুভূতি আর জীবনানন্দ দাশের অনুভূতি সম্পূর্ণ ভিন্ন—উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

২. 'বাংলার হাওয়া বাংলার জল
হৃদয় আমার করে সুশীতল
এত সুখ শান্তি এত পরিমল
কোথা পাব আর বাংলা ছাড়া।'

ক. 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটি কোন কাব্য থেকে নেয়া হয়েছে ?

খ. 'বাংলার সবুজ করুণ ডাঙা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?

গ. উদ্দীপক অবলম্বনে 'আবার আসিব ফিরে' কবিতার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দাও।

ঘ. 'কোথা পাব আর বাংলা ছাড়া'- কথাটির সঙ্গে কবি জীবনানন্দ দাশের বাংলায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা কীভাবে সম্পর্কিত— আলোচনা কর।

রুপাই

জসীমউদ্‌দীন

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে লম্বা মাথার চুল,
কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কিসের রঙিন ফুল!
কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি-মুখের মায়া,
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।
জালি লাউয়ের ডগার মতো বাহু দুখান সরু,
গা খানি তার শাওন মাসের যেমন তমাল তরু।
বাদল-ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজলি মেয়ে পিছ্‌লে পড়ে ছড়িয়ে আলোর খেল।
কচি ধানের তুলতে চারা হয়ত কোনো চাষি,
মুখে তাহার জড়িয়ে গেছে কতকটা তার হাসি।

কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দাঁতের কালি দিয়েই কেতাব কোরান লেখি।
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়;
চাষিদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়।
সোনায় যে-জন সোনা বানায়, কিসের গরব তার'
রং পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার।
কালোয় যে-জন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন,
তারির পদ-রজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন।
সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ,
কালো-বরন চাষির ছেলে জুড়ায় যেন বুক।
যে কালো তার মাঠেরি ধান, যে কালো তার গাঁও!
সেই কালোতে সিনান্ করি উজল তাহার গাও।

আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানাটানি।
জারির গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
'শাল-সুন্দি-বেত' যেন ও, সকল কাজেই লাগে।
বুড়োরা কয়, ছেলে নয় ও, পাগাল লোহা যেন,
রুপাই যেমন বাপের বেটা কেউ দেখেছ হেন?
যদিও রুপা নয়কো রুপাই, রুপার চেয়ে দামি,
এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামি।

শব্দার্থ ও টীকা

ভ্রমর — ভোমরা, মৌমাছি, মধুকর।

নবীন তৃণ — নতুন ঘাস বা দূর্বা। এখানে কচি ঘাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

জালি — কচি, সদ্য অঙ্কুরিত।

শাওন — শ্রাবণ, বঙ্গাব্দের চতুর্থ মাসের নাম।

কালো দাত — লেখার কালি রাখার পাত্র বিশেষ, দোয়াত।

গরব — গর্ব, অহংকার।

রামধনুকের হার — অর্ধবৃত্তাকার রংধনুকে গলার হার হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে।

পদ-রজ — পায়ের ধুলা, চরণধূলি।

বৃন্দাবন — মথুরার নিকটবর্তী হিন্দুদের তীর্থস্থান, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের লীলাক্ষেত্র।

সিনান্ — স্নান, গোসল, অবগাহন।

উজল — উজ্জ্বল, দীপ্তিমান।

আখড়াতে — নৃত্যগীত শিক্ষা ও মল্লবিদ্যা অভ্যাসের স্থান, আড্ডা।

শাল-সুন্দি-বেত — শাল অর্থ শালগাছ বা মূল্যবান কাঠ, সুন্দি অর্থ শ্বেতপদ্ম। একত্রে বিবিধ কাজের প্রয়োজনীয় উপকরণ। কবিতায় রূপাইকে এমনই উপকারী হিসাবে দেখানো হয়েছে।

জারির গান — শোকগীতি, মূলত কারবালার শোকাবহ ঘটনামূলক গাথা।

পাগাল — ইস্পাত। পাগাল লোহা বলতে ইস্পাতযুক্ত বা ইস্পাতসম কঠিন লোহাকে বোঝানো হয়েছে।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রকৃতিকে ভালোবাসতে পারবে। তারা গ্রামীণ সৌন্দর্য সম্পর্কেও অবহিত হবে। সর্বোপরি শিক্ষার্থীরা প্রকৃতির পটভূমিতে গ্রামীণ কৃষকের শৈল্পিক রূপ অনুধাবনও করতে পারবে।

পাঠ-পরিচিতি

কবি জসীমউদ্‌দীন রচিত 'নক্সী কাঁথার মাঠ' নামক কাহিনীকাব্যের এ অংশটুকু 'রূপাই' কবিতা শিরোনামে সংকলিত হয়েছে। এ কবিতায় কবি গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি কৃষকের রূপ ও কর্মোদ্যোগ অসাধারণ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। গ্রাম-বাংলার প্রকৃতির মধ্যে কালো ভ্রমর, রঙিন ফুল, কাঁচা ধানের পাতা এবং কচি মুখের মায়াবী কৃষককে প্রায়শই দেখতে পাওয়া যায়। কৃষকের বাহু দুইখানি লাউয়ের কচি ডগার মতো বলে মনে হয়।

রোদে পুড়ে কৃষকের শরীরের রং কালো হয়ে যায়। এ কালো কালি দিয়েই পৃথিবীর সমস্ত কেতাব বা গ্রন্থ লেখা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কবির মতে, কৃষকের শ্রমেই সভ্যতার ইতিহাস সৃষ্টি হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব কিছুই কৃষকের কালো। আর এ কালো কৃষকই পৃথিবীর সবকিছু জয় করেছে।

কালোকৃষকটি আখড়াতে বা জারির গানে যেমন দক্ষ তেমনি সকল কাজে পারদর্শী। তাই কবির দৃষ্টিতে এ কৃষক সবার কাছে দামি বলে গণ্য হয়েছে। ২০১৮

কবি-পরিচিতি

কবি জসীমউদ্‌দীন ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. পাস করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি পাঁচ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। পরে তিনি সরকারের তথ্য ও প্রচার বিভাগে উচ্চপদে যোগ দেন। ছাত্রজীবনেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন তাঁর লেখা 'কবর' কবিতাটি বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। তাঁর কবিতায় আমরা পল্লির মানুষ ও প্রকৃতির সহজ-সুন্দর রূপটি দেখতে পাই। পল্লির মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর কবিহৃদয় যেন এক হয়ে মিশে আছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাহিনীকাব্য : 'নক্সী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'; কাব্যগ্রন্থ : 'রাখালী', 'বালুচর','মাটির কান্না'; নাটক : 'বেদের মেয়ে'; উপন্যাস : 'বোবা কাহিনী' ; গানের সংকলন : 'রঙিলা নায়ের মাঝি'। তাঁর শিশুতোষ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : 'হাসু','এক পয়সার বাঁশী','ডালিমকুমার'। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানসূচক ডি.লিট. ডিগ্রি এবং বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক পেয়েছেন। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. 'রূপাই' কবিতা অবলম্বনে একজন গ্রামীণ কৃষকের চরিত্রে অভিনয় করে দেখাও (একক কাজ)।

খ. 'রূপাই' কবিতার সাহায্যে গ্রামীণ প্রকৃতি নিয়ে ছড়া, কবিতা ও গল্প লিখে শ্রেণিতে প্রদর্শনের আয়োজন কর (দলগত কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'রূপাই' কবিতাটি পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে ?

ক. রাখালি খ. নক্সী কাঁথার মাঠ

গ. সুজন বাদিয়ার ঘাট ঘ. বালুচর

২. কবি চাষির ছেলের বাহুকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন ?

ক. কাঁচা ধানের পাতা খ. জালি লাউয়ের ডগা

গ. শাওন মাসের তমাল তরু ঘ. কচি ধানের চারা

৩. 'কালো দাঁতের কালি দিয়ে কেতাব কোরান লেখি'– চরণটির 'কালো দাঁত' বলতে যা বোঝানো হয়েছে– তা হলো :

i. লেখার কালি রাখার পাত্রবিশেষ

ii. কালো দন্তবিশেষ

iii. দোয়াত

কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ভোরের প্রকৃতিতে শিশিরে ভেজা কচিঘাসের হালকা সবুজ রং আমাদের আকর্ষণ করে। মনে হয়, সবুজ ঘাস এক মায়াময় ছায়া বিস্তার করে আছে। এ ছায়া আমাদের মনে কোমল অনুভূতির সৃষ্টি করে।

৪. উদ্দীপকের সাথে 'রূপাই' কবিতার যে-চরণটির মিল পাওয়া যায়– তা হলো :

ক. কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি মুখের মায়া

খ. তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া

গ. জালি লাউয়ের ডগার মতো বাহু দুখান সরু

ঘ. কচিধানের তুলতে চারা হয়ত কোনো চাষি

৫. উদ্দীপক ও 'রূপাই' কবিতায় কবির কোন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় ?

ক. প্রকৃতিপ্রীতি খ. মর্ত্যপ্রীতি

গ. কৃষকপ্রীতি ঘ. মানবপ্রীতি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। পল্লিগ্রামের পিতৃহীন এক দুরন্ত বালক ছমির শেখ। ফসল বোনার ওস্তাদিতে দশগ্রামে তার সুনাম আছে। বন্যা-খরা তথা গ্রামের শত বিপদে বৃক্ষের ছায়ার মতো তাকে সবাই কাছে পায়। যাত্রাপালার অভিনয়ে তার জুড়িমেলা ভার। গ্রামের সবাই তাকে স্নেহ করে; যেমন প্রকৃতি করে গ্রামকে।

ক. চাষির ছেলের 'গা-খানি' দেখতে কেমন?

খ. "চাষিদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়"– চরণটির মাধ্যমে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. উদ্দীপক ও 'রূপাই' কবিতার আলোকে তোমার দেখা কোনো পল্লিগ্রামের বর্ণনা দাও।

ঘ. 'উদ্দীপকটি রূপাই কবিতার খণ্ডাংশ মাত্র'– যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

নদীর স্বপ্ন

বুদ্ধদেব বসু

কোথায় চলেছো? এদিকে এসো না!
দুটো কথা শোনো দিকি,
এই নাও — এই চকচকে, ছোটো,
নতুন রুপোর সিকি।
ছোকানুর কাছে দুটো আনি আছে,
তোমায় দিচ্ছি তাও,
আমাদের যদি তোমার সঙ্গে
নৌকায় তুলে নাও।
নৌকা তোমার ঘাটে বাঁধা আছে —
যাবে কি অনেক দূরে?
পায়ে পড়ি, মাঝি, সাথে নিয়ে চলো
মোরে আর ছোকানুরে।
আমারে চেনো না? আমি যে কানাই।
ছোকানু আমার বোন।
তোমার সঙ্গে বেড়াবো আমরা
মেঘনা, পদ্মা, শোণ।
শোনো, মা এখন ঘুমিয়ে আছেন,
দিদি গেছে ইশকুলে,
এই ফাঁকে মোরে — আর ছোকানুরে —
নৌকোয় নাও তুলে।
কোনো ভয় নেই — বাবার বকুনি
তোমায় হবে না খেতে,
যত দোষ সব আমরা — না, আমি
একা নেবো মাথা পেতে।

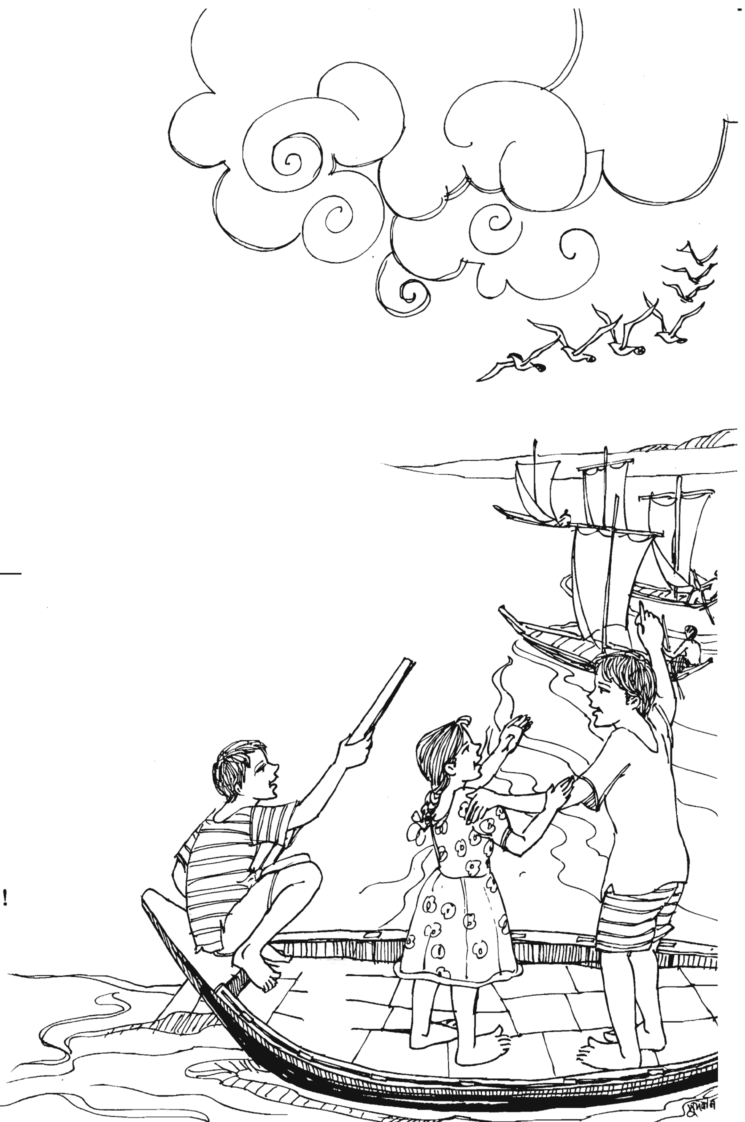

ওটা কী? জেলের নৌকা? — তাই তো!
জাল টেনে তোলা দায়,
রুপোলি নদীর রুপোলি ইলিশ —
ইশ, চোখে ঝলসায়!
ইলিশ কিনলে? — আঃ, বেশ, বেশ,
তুমি খুব ভালো, মাঝি।

উনুন ধরাও, ছোকানু দেখাক
রান্নার কারসাজি।
পইঠায় বসে ধোঁয়া-ওঠা ভাত,
টাটকা ইলিশ-ভাজা —
ছোকানু রে, তুই আকাশের রানি,
আমি পদ্মার রাজা।

খাওয়া হলো শেষ, আবার চলছি
দুলছে ছোট্ট নাও,
হালকা নরম হাওয়ায় তোমার
লাল পাল তুলে দাও।
ছোকানুর চোখ ঘুমে ঢুলে আসে
আমি ঠিক জেগে আছি,
গান গাওয়া হলে আমায় অনেক
গল্প বলবে, মাঝি?
শুনতে শুনতে আমিও ঘুমোই
বিছানা বালিশ বিনা —
মাঝি, তুমি দেখো ছোকানুরে, ভাই,
ও বড়োই ভীতু কিনা।
আমার জন্যে কিচ্ছু ভেবো না
আমি তো বড়োই প্রায়
ঝড় এলে ডেকো আমারে — ছোকানু
যেন সুখে ঘুম যায়।

[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

সিকি – চার আনা মূল্যের মুদ্রা বা ২৫ পয়সার মুদ্রা।
আনি – এক টাকার ষোল ভাগের এক ভাগ মূল্যের মুদ্রা।
শোণ – একটি নদীর নাম।
কারসাজি – কূটকৌশল। এখানে চমৎকারিত্ব অর্থে কাব্যিক ব্যবহার।
পাল – বাতাসের সাহায্যে চালাবার জন্য নৌকায় খাটানো মোটা কাপড়ের পর্দা।

পাঠের উদ্দেশ্য

এই কবিতা পাঠ করার কারণে শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তির প্রসার ঘটবে। প্রকৃতি ও দেশের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে। ভাইবোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক তৈরি হবে।

পাঠ-পরিচিতি

বুদ্ধদেব বসুর 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় নদী এবং নৌভ্রমণ নিয়ে এক কিশোরের কল্পনা রূপায়িত হয়েছে। দুরন্ত এক কিশোর তার ছোট বোনকে নিয়ে নৌকাতে উঠে নদীর পর নদী পার হয়ে তাদের মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায়। নৌকার নানা রঙের পাল, নীল রঙের আকাশ, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির উড়ে চলা, রুপালি ইলিশ মাছ, নৌকায় রান্না করা, সন্ধ্যায় গান গাওয়া, গল্প করা—এত কিছু কিশোর মনে গভীর স্বপ্ন নিয়ে আসে। পাশাপাশি এ কবিতায় বোনের প্রতি ভাইয়ের দায়িত্ব ও আদর প্রকাশের চমৎকার নিদর্শন আছে ।

কবি-পরিচিতি

বুদ্ধদেব বসু বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি কবিতা, ছড়া, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, ভ্রমণ-কাহিনী, স্মৃতিকথা, অনুবাদ, সম্পাদনা ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতক (সম্মান) এবং পরের বছর প্রথম শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রথমে সাংবাদিকতা এবং পরে অধ্যাপনাকে তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। ঢাকার পুরানা পল্টন থেকে তাঁর ও অজিত দত্তের যৌথ সম্পাদনায় সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'প্রগতি' (১৯২৭-১৯২৯) প্রকাশিত হয়। তিনি 'কবিতা পত্রিকা' নামেও একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যরীতির বাইরে পৃথক কাব্যধারার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কবি বুদ্ধদেব বসুর রচনাশৈলী স্বতন্ত্র ও মনোজ্ঞ। তিনি বহু কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও নাটক রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। বুদ্ধদেব বসু ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুর অর্থাৎ বর্তমানের মুন্সিগঞ্জে। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার ভালো লাগার স্বপ্ন নিয়ে কবিতা, গল্প বা নাটিকা রচনা কর (একক কাজ)।
খ. 'নদীর স্বপ্ন' কবিতাটির একটি গদ্যরূপ উপস্থাপন কর (দলগত কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোথায় চলেছো? এদিকে এসো না!
দুটো কথা শোনো দিকি,

চরণটিতে প্রকাশ পেয়েছে—

ক. আদেশ খ. নির্দেশ
গ. অনুরোধ ঘ. অনুনয়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

কিশোর মোরা ঊষার আলো, আমরা হাওয়া দুরন্ত,
মনটি চির বাঁধন হারা, পাখির মতো উড়ন্ত।

২. উদ্দীপকের দ্বিতীয় চরণের অর্থের সাথে নিচের কোন চরণের অর্থের মিল পাওয়া যায়?

ক. পায়ে পড়ি, মাঝি সাথে নিয়ে চলো, মোরে আর ছোকানুরে
খ. ছোকানুরে, তুই আকাশের রানি, আমি পদ্মার রাজা
গ. শুনতে শুনতে আমিও ঘুমোই – বিছানা বালিশ বিনা
ঘ. এই ফাঁকে মোরে—আর ছোকানুরে, নৌকায় তুলে নাও

৩. উক্ত পঙ্‌ক্তি দুটিতে যে আবেগ প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে—

i. কিশোর মনের উচ্ছ্বাস
ii. ভাই ও বোনের সত্যিকার মর্যাদা
iii. কল্পনার অবাধ প্রবাহ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

৪. নিশু,লিজা,শ্যামা,মিথিয়া,পিয়া বড়দের দৃষ্টি এড়িয়ে সাগরদিঘী পাড়ে মিলিত হয়েছে। বাড়ি থেকে চাল, ডাল, ডিম, মসলা— সবকিছু নিয়ে এসেছে। জমিয়ে পিকনিক হবে। রান্নার ধূম লেগেছে। রান্না শেষ হতেই নিশুর দেখাদেখি সবাই দিঘির জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দাপাদাপি যেন শেষ হতেই চায় না। শেষে পিয়ার চেঁচামেচিতে সবাই এসে কলাপাতায় পাত পেড়ে খেতে বসল। খাবার মুখে দিয়েই এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। নুন—নুন দেয়া হয় নি যে। আবার এক দফা হেসে নিয়ে সবাই গপাগপ খিচুড়ি খেতে বসে গেল। খুউব ক্ষুধা পেয়েছে যে!

ক. দুপুরের রোদে জল কেমন করে বয়ে চলে?
খ. নৌকা-ভ্রমণের বিনিময়ে কানাই মাঝিকে আনি বা পয়সা দিতে চেয়েছিল কেন?—ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের সাথে কবিতার কী অমিল লক্ষ করা যায়—আলোচনা কর।
ঘ. বিষয়বস্তু ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও কবিতাটি কিশোর মনের আবেগ প্রকাশের দিক থেকে অভিন্ন—বিশ্লেষণ কর।

জাগো তবে অরণ্য কন্যারা

সুফিয়া কামাল

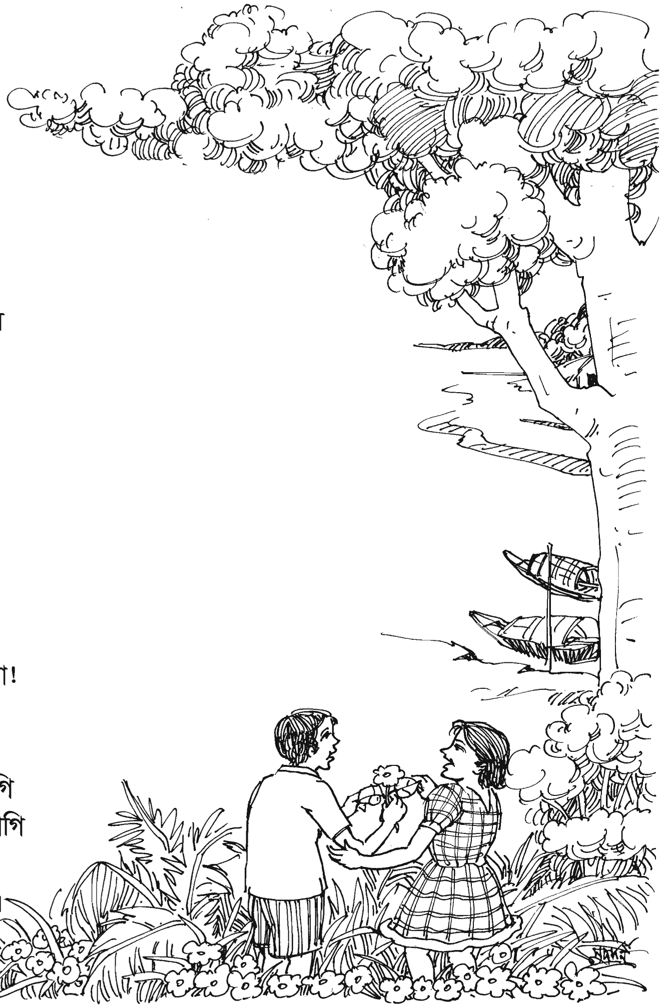

মৌসুমি ফুলের গান মোর কণ্ঠে জাগে নাকো আর
চারিদিকে শুনি হাহাকার।
ফুলের ফসল নেই, নেই কারও কণ্ঠে আর গান
ক্ষুধার্ত ভয়ার্ত দৃষ্টি প্রাণহীন সব মুখ ম্লান।

মাটি অরণ্যের পানে চায়
সেখানে ক্ষরিছে স্নেহ পল্লবের নিবিড় ছায়ায়।
জাগো তবে অরণ্য কন্যারা! জাগো আজি,
মর্মরে মর্মরে ওঠে বাজি
বৃক্ষের বক্ষের বহ্নিজ্বালা
মেলি লেলিহান শিখা তোমরা জাগিয়া ওঠো বালা!
কঙ্কণে তুলিয়া ছন্দ তান
জাগাও মুমূর্ষু ধরা-প্রাণ
ফুলের ফসল আনো, খাদ্য আনো ক্ষুধার্তের লাগি
আত্মার আনন্দ আনো, আনো যারা রহিয়াছে জাগি
তিমির প্রহর ভরি অতন্দ্র নয়ন, তার তরে
ছড়াও প্রভাত আলো তোমাদের মুঠি ভরে ভরে।

[সংক্ষেপিত]

২০১৬

শব্দার্থ ও টীকা

ক্ষুধার্ত ভয়ার্ত দৃষ্টি	— প্রকৃতিতে ফুল ও ফসলের সম্ভার কমে যাওয়ায় মানুষের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে। বিলীন হওয়ার আশঙ্কায় মানুষ ভীত।
ম্লান	— মলিন।
ক্ষরিছে	— চুয়ে চুয়ে পড়ছে।
পল্লব	— গাছের নতুন পাতা। ডালের নতুন পাতাযুক্ত আগা।
সেখানে ক্ষরিছে স্নেহ পল্লবের নিবিড় ছায়ায়	— মাটির মমতা রস পেয়ে বৃক্ষ শাখায় নতুন পাতা গজিয়েছে।
জাগো তবে অরণ্য কন্যারা	— কবি বৃক্ষ-কন্যাদের জেগে ওঠার আহ্বান জানাচ্ছেন প্রকৃতিকে আবার শ্যামল সবুজে ফলে-ফুলে ভরিয়ে তোলার জন্যে।
বৃক্ষের বক্ষের বহ্নিজ্বালা	— মানুষ প্রকৃতির ওপর হস্তক্ষেপ করায় বন উজাড় হচ্ছে। বৃক্ষনিধন বাড়ছে। বৃক্ষের বুকে তাই যন্ত্রণার আগুন।
মেলি লেলিহান শিখা	— কবি তরু কন্যাকে আহ্বান জানাচ্ছেন তার শাখায় শাখায় আগুন রঙা ফুল ফুটিয়ে আকাশে শাখা বিস্তার করতে।
কঙ্কণ	— কাঁকন, নারীর হাতের অলঙ্কার বিশেষ।
মুমূর্ষু	— মৃতপ্রায়। মরণাপন্ন। মরে যাচ্ছে এমন।
ধরা-প্রাণ	— পৃথিবীর জীবন।
অতন্দ্র	— তন্দ্রাহীন। ঘুমহীন। নির্ঘুম। নিদ্রাহীন।
নয়ন	— চোখ।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রকৃতি জগতের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগে আগ্রহী হবে এবং প্রকৃতির ঐশ্বর্য রক্ষায় সচেতন হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতাটি সুফিয়া কামালের 'উদাত্ত পৃথিবী' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। প্রকৃতির রূপ-সচেতন কবি চারপাশের অরণ্য-নিধন লক্ষ্য করে ব্যথিত। তাই মৌসুমি ফুলের গান আর তার কণ্ঠে জাগে না। বরং চারপাশে সবুজ প্রকৃতির বিলীন হওয়া দেখে তাঁর মন হাহাকার করে ওঠে। কবি তাই অরণ্য-কন্যাদের জাগরণ প্রত্যাশা করেন। তিনি চান দিকে দিকে আবার সবুজ বৃক্ষের সমারোহের সৃষ্টি হোক; ফুলে ও ফসলে ভরে উঠুক পৃথিবী; মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা পাক বিপন্নতার হাত থেকে।

কবি-পরিচিতি

সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালের ২০শে জুন বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদ গ্রামে তাঁর মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল কুমিল্লায়। সে আমলে মেয়েদের লেখাপড়ার মোটেই সুযোগ ছিল না। তিনি নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে ছোটবেলা থেকেই কবিতাচর্চা শুরু করেছিলেন। কিছুকাল তিনি কলকাতার একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। সুদীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যচর্চা, সমাজসেবা ও নারী কল্যাণমূলক নানা কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর কবিতা সহজ, ভাষা সুললিত, ছন্দ ব্যঞ্জনাময়। কবি সুফিয়া কামালের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলো : 'সাঁঝের মায়া', 'মায়া কাজল', 'মোর যাদুদের সমাধি পরে'। তাঁর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ 'একাত্তরের ডাইরি'; শিশুদের জন্য তিনি লিখেছেন 'ইতল বিতল' ও 'নওল কিশোরের দরবারে'।

২০১৯

কবি সুফিয়া কামাল তাঁর কবি প্রতিভার জন্য অনেক পুরস্কার লাভ করেছেন। সেসব হলো : বাংলা একাডেমি পুরস্কার, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, একুশে পদক, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি পুরস্কার, মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার, স্বাধীনতা পুরস্কার ইত্যাদি। তিনি ১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. দূষণমুক্ত প্রকৃতি রক্ষায় পোস্টার প্লাকার্ডসহ র‍্যালির আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর দলগত কাজ)।

খ. তোমার চারপাশের পরিবেশ, বিশেষ করে গাছপালা রক্ষায় তুমি কী ভূমিকা রাখতে পার সে বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন রচনা কর (একক কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. মৌসুমে ফুলের গান কার কণ্ঠে আর জাগে না ?

ক. সাধারণ মানুষের খ. সুফিয়া কামালের
গ. অরণ্যের ঘ. পাখির

২. কবি কেন ব্যথিত হন ?

ক. ফুল-ফল না থাকায় খ. মৌসুমি গান না শোনায়
গ. অরণ্য-নিধন লক্ষ্য করে ঘ. বৃক্ষের বহ্নিজ্বালা দেখে

৩. কবি অরণ্য-কন্যাদের জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন কেন ?

ক. পৃথিবীতে সবুজের বিস্তারের জন্য খ. মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য
গ. ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য ঘ. মৌসুমি ফুল দেখার জন্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলছে। এ বাড়তি জনসংখ্যার জন্য প্রতিনিয়ত কমছে আবাদি জমি, বন, জঙ্গল। ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা—ঘটছে পরিবেশ বিপর্যয়। বিষয়টি উপলব্ধি করে মফিজ খাঁ এবং আমিনা বেগম বৃক্ষমেলা থেকে প্রচুর চারা কিনে এনে এলাকার শিক্ষার্থীদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু করেন।

৪. উদ্দীপকে বর্ণিত বাড়তি জনসংখ্যার ফলে সৃষ্ট সমস্যাটি ‘জাগো তবে অরণ্য কন্যারা’ কবিতার কোন অবস্থাকে নির্দেশ করে ?

ক. ফুল-ফলশূন্য পৃথিবী খ. বৃক্ষ-শূন্য পৃথিবী
গ. নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন ঘ. বৃক্ষের সমারোহ সৃষ্টি

৫. এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য ‘জাগো তবে অরণ্য কন্যারা’ কবিতায় যে নির্দেশনা রয়েছে তা হলো—

i. লাগাও গাছ, বাঁচাও দেশ
ii. বৃক্ষ মাটির মুক্তিদাতা
iii. চারিদিকে সবুজের সমারোহ সৃষ্টি হোক

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. দোয়েল পাখি বাসা বেঁধেছে জবা গাছে। সোহেল তার নতুন ঘর তোলার জন্য আঙিনার অন্যান্য গাছের সাথে জবা গাছও কেটে ফেলে। দোয়েলের চোখে-মুখে বাসা হারানোর বেদনা। দোয়েল আর গান গায় না। ফুলের সাথে খেলা করে না। অন্যদিকে নিলয় তার বাড়ির আঙিনার খালি জায়গায় ফুল, ফল ও অন্যান্য গাছ লাগায়। গাছগুলোকে সে নিজের মতো ভালোবাসে। তার বাগান দেখে সকলের চোখ জুড়ায়। পাখিরা তার বাগানে চলে আসে। তারা গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়। বিভিন্ন ফলের গাছ থেকে খাদ্য জোগাড় করে, ফুলের সাথে খেলা করে, গান গায়। দিনের শেষে নিশ্চিন্ত মনে বাসায় ফিরে ঘুমায়। নিলয়কে দেখে অনেকেই গাছ লাগাতে উদ্বুদ্ধ হয়।

ক. গাছের নতুন পাতাকে কী বলে?
খ. 'বৃক্ষের বক্ষের বহ্নিজ্বালা' বলতে কী বুঝানো হয়েছে ?
গ. দোয়েলের অভিব্যক্তিতে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের নিলয়ের কর্মকাণ্ডের মধ্যেই কবির প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে। বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

২. সিডরের খবর শুনে মিথিয়ার ভীষণ মন খারাপ। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষ ঘর-বাড়ি হারা, খাবার নেই। কী ভীষণ বিপন্ন মানুষ। অথচ এর জন্য মানুষই অনেকটা দায়ী। মানুষ গাছ কেটে বন উজাড় করছে। ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ছে। এসব দেখে মিথিয়া অনুভব করে একটা কিছু করবে। সে তার বন্ধুদের নিয়ে বাড়ির খালি আঙ্গিনায়, ছাদে গাছ লাগানোর জন্য মানুষকে সচেতন করে তোলে। তাছাড়া গাছ কেটে বন উজাড় করার বিরুদ্ধে সে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সে ভাবে এই সুন্দর বনই অনেক বেশি ক্ষতির হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে। মিথিয়া স্বপ্ন দেখে ফুলে-ফলে ভরা সতেজ-সবুজ প্রকৃতির।

ক. কবি সুফিয়া কামাল এখন আর কীসের গান শুনতে পান না ?
খ. 'ক্ষুধার্ত ভয়ার্ত দৃষ্টি' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন ?
গ. মিথিয়ার মন খারাপের বিষয়টির সাথে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কোন দিকটির মিল খুঁজে পাওয়া যায় ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. মিথিয়া যেন কবির সেই অরণ্য-কন্যা—উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

প্রার্থী

সুকান্ত ভট্টাচার্য

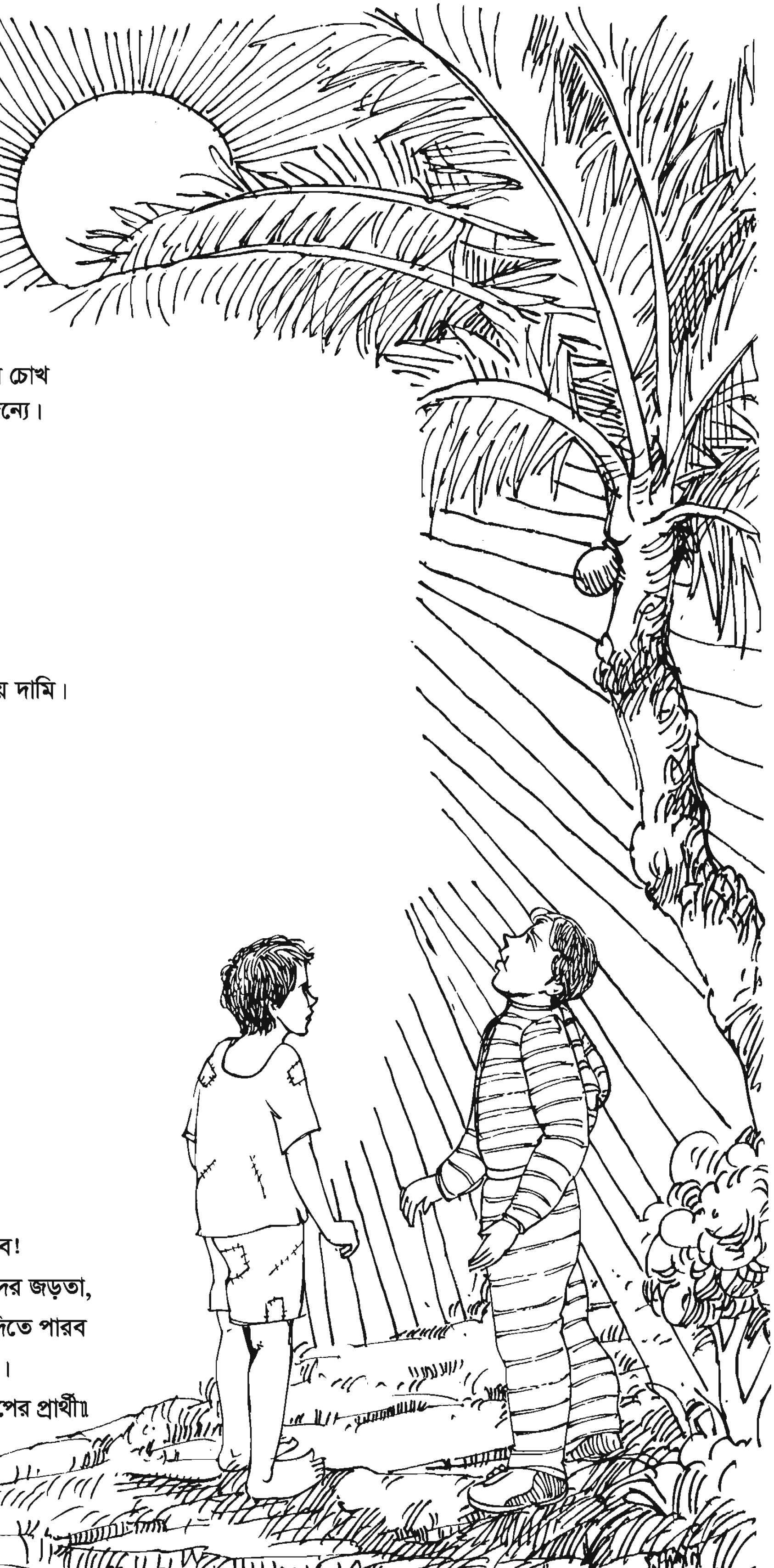

হে সূর্য! শীতের সূর্য!
হিমশীতল সুদীর্ঘ রাত তোমার প্রতীক্ষায়
আমরা থাকি
যেমন প্রতীক্ষা করে থাকে কৃষকের চঞ্চল চোখ
ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলির জন্যে।

হে সূর্য, তুমি তো জানো,
আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব!
সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে
এক টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে,
কত কষ্টে আমরা শীত আটকাই!

সকালের এক টুকরো রোদ্দুর—
এক টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামি।

ঘর ছেড়ে আমরা এদিক ওদিকে যাই—
এক টুকরো রোদ্দুরের তৃষ্ণায়।

হে সূর্য!
তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও,
আর উত্তাপ দিও
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।

হে সূর্য!
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও—
শুনেছি, তুমি এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড,
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই
এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হব!
তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা,
তখন হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারব
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
আজ কিন্তু আমরা তোমার অকৃপণ উত্তাপের প্রার্থী॥

শব্দার্থ ও টীকা

প্রার্থী	— প্রার্থনাকারী, আবেদনকারী।
হিমশীতল	— তুষারের মতো ঠান্ডা।
স্যাঁতসেঁতে	— ভিজে ভিজে ভাবযুক্ত।
অগ্নিপিণ্ড	— আগুনের গোলা।
জড়তা	— জড়তার ভাব। আড়ষ্টতা।
অকৃপণ	— কৃপণ নয় এমন। উদার।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীদের মনে অবহেলিত, বঞ্চিত ও দীন-দরিদ্র মানুষের প্রতি মমতা সৃষ্টি হবে। অন্নহীন, বস্ত্রহীন ও আশ্রয়হীন মানুষের দুর্দশায় তারা ব্যথিত হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'প্রার্থী' কবিতাটি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। আমাদের এই পৃথিবীতে শক্তির মূল উৎস সূর্য। সূর্য যে তাপ বিকিরণ করে তার সাহায্যেই ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানুষ জীবনধারণ করে। প্রচণ্ড শীতে সূর্যের এই উত্তাপের জন্য সারারাত অপেক্ষা করে বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন শীতার্ত মানুষ। কবি সমাজের নিচুতলার মানুষের প্রতি গভীর মমতা থেকে সূর্যের কাছে উত্তাপ প্রার্থনা করেছেন। অবহেলিত ও বঞ্চিত শিশুর প্রতি তাঁর অসীম মমতা। কবি এই শিশুদের কল্যাণে সূর্যের অবদান থেকে প্রেরণা নিতে চান। তিনি এমন সমাজ গড়তে চান— যাতে বস্ত্রহীন শীতার্ত মানুষের জীবন থেকে সব দুঃখ চিরতরে ঘুচে যায়।

কবি-পরিচিতি

সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায়। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের এই সন্তান অল্প বয়সেই শোষিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তির আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করে তোলেন। বামপন্থি-বিপ্লবী কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। বঞ্চনাকাতর মানুষের জীবন-যন্ত্রণার চিত্র যেমন তাঁর কবিতায় অঙ্কিত হয়েছে তেমনি প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের সুর উচ্চারিত হয়েছে। তিনি সেকালের দৈনিক পত্রিকা 'স্বাধীনতা'র কিশোর সভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। আমৃত্যু তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কবিতায় মানবমুক্তির জয়গান বলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত হয়েছে। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থে'র নাম : 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই', 'পূর্বাভাস', 'অভিযান', 'হরতাল' ও 'গীতিগুচ্ছ'। সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে মাত্র একুশ বছর বয়সে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. ধনী-দরিদ্র বিচারে মানুষের মূল্যায়ন হতে পারে না– এই বিষয়ের উপর একটি বির্তক প্রতিযোগিতা আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর দলগত অংশগ্রহণে)।

খ. দারিদ্র্য কখনোই মানুষকে মহৎ করতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের উচিত কর্তব্যনিষ্ঠা, শ্রম ও মেধা প্রয়োগ করে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো। এ বিষয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর দলগত অংশগ্রহণে)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কত বছর বয়সে মারা যান ?

ক. ২১ খ. ২২
গ. ২৩ ঘ. ২৫

২. সকালের এক টুকরো রোদকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে ?

ক. কৃষকের চঞ্চল চোখ খ. এক টুকরো সোনা
গ. এক টুকরো গরম কাপড় ঘ. এক জলনত অগ্নিপিন্ড

৩. সূর্যের কাছে রাস্তার ধারের উলঙ্গ ছেলেটার জন্য উত্তাপ চাওয়ার মধ্যে কবির যে অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তা হলো—

i. সহযোগিতা
ii. সহমর্মিতা
iii. সহনশীলতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. iii
গ. ii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

লিয়াকতের বাবা অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। সেই থেকে সে প্রচন্ড শোক বুকে নিয়ে ঢাকা শহরে রিকশা চালিয়ে তিল তিল করে সঞ্চয় করে কিছু টাকা। আর সে টাকা দিয়ে তার গ্রামের বাড়ি বরিশালে গড়ে তোলে একটি হাসপাতাল; যাতে কোনো অসহায়, দুঃস্থ মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়।

৪. লিয়াকতের কার্যক্রমে 'প্রার্থী' কবিতার যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা হলো—

i. মহানুভবতা
ii. মানবতা
iii. মমত্ববোধ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. iii
গ. ii ঘ. i, ii ও iii

৫. 'প্রার্থী' কবিতায় কবি সুকান্তের জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড হওয়া আর উদ্দীপকে লিয়াকতের শোকগ্রস্ত হওয়া আসলে—

i. আর্ত-মানবতার কল্যাণ করা
ii. কল্যাণের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হওয়া
iii. মানুষ মানুষের জন্য—এ সত্যে উদ্বুদ্ধ হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নাদিম সাহেব দামি গাড়ি হাঁকিয়ে বারিধারা অফিসে যাবার পথে বিজয়সরণি সিগন্যালে অপেক্ষা করেন। জীর্ণ-শীর্ণ এক ভিক্ষুক তাঁর গাড়ির জানালার পাশে ভিক্ষার থালা বাড়িয়ে দিলে তিনি জানালার কালো গ্লাস তুলে দেন। আর ভীষণ বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন— রাবিশ, ভিক্ষুকে দেশটা ভরে গেছে। কথা শুনে ড্রাইভার মহসীন বলে— স্যার, গরিব মানুষ, কী করবে বলেন? এই ভিক্ষার আয় রোজগার দিয়েই তো ওরা সংসার চালায়।

ক. 'প্রার্থী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত ?
খ. কবি সূর্যকে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড বলেছেন কেন ?
গ. উদ্দীপকের নাদিম সাহেবের আচরণ 'প্রার্থী' কবিতার কোন ভাবের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ?— বর্ণনা কর।
ঘ. ড্রাইভার মহসীনের অভিব্যক্তিতে 'প্রার্থী' কবিতার মূল চেতনা প্রকাশ পেলেও কবি সুকান্তের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নি— মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর।

২. 'দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবু সাব তারে ঠেলে দিল নিচে ফেলে!
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি ক'রে কী জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল ?'

ক. 'হিমশীতল' অর্থ কি ?
খ. আমাদের গরম কাপড়ের অভাব কীভাবে দূর হতে পারে ? ব্যাখ্যা কর।
গ. কবিতাংশের প্রথম তিন চরণে 'প্রার্থী' কবিতার যে দিকটির সাথে বৈসাদৃশ্য রয়েছে তার বর্ণনা দাও।
ঘ. উদ্দীপকের শেষ চরণের বক্তব্যে 'প্রার্থী' কবিতায় কবির অভিমতের প্রতিফলন ঘটেছে কি – যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

মাগো ওরা বলে

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

“কুমড়ো ফুলে–ফুলে
নুয়ে পড়েছে লতাটা,
সজনে ডাঁটায়
ভরে গেছে গাছটা
আর আমি
ডালের বড়ি শুকিয়ে রেখেছি।
খোকা তুই কবে আসবি?
কবে ছুটি ?”

চিঠিটা তার পকেটে ছিল
ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা।

“মাগো, ওরা বলে
সবার কথা কেড়ে নেবে।
তোমার কোলে শুয়ে
গল্প শুনতে দেবে না।

বলো, মা,
তাই কি হয়?
তাই তো আমার দেরি হচ্ছে।
তোমার জন্য
কথার ঝুরি নিয়ে
তবেই না বাড়ি ফিরব।

লক্ষ্মী মা,
রাগ কোরো না
মাত্র তো আর কটা দিন।”
“পাগল ছেলে!”
মা পড়ে আর হাসে,

"তোর ওপরে রাগ করতে পারি!"
নারকেলের চিড়ে কোটে
উড়কি ধানের মুড়কি ভাজে,
এটা–সেটা
আরও কত কী!
তার খোকা যে বাড়ি ফিরবে
ক্লান্ত খোকা।

কুমড়ো ফুল
শুকিয়ে গেছে,
ঝরে পড়েছে ডাঁটা।
পুঁই লতাটা নেতানো।

"খোকা এলি?"
ঝাপসা চোখে মা তাকায়
উঠানে–উঠানে
যেখানে খোকার শব
শকুনিরা ব্যবচ্ছেদ করে।

এখন
মার চোখে চৈত্রের রোদ
পুড়িয়ে দেয় শকুনিদের।
তারপর
দাওয়ায় বসে
মা আবার ধান ভানে,
বিন্নি ধানের খই ভাজে,
খোকা তার
কখন আসে কখন আসে।

এখন
মার চোখে শিশির–ভোর
স্নেহের রোদে ভিটে ভরেছে।

২০১৫

শব্দার্থ ও টীকা

ব্যবচ্ছেদ–মৃতদেহ কাটাকাটি করে মৃত্যুর কারণ বের করার পদ্ধতি।

দাওয়া–বারান্দা।

সবার কথা কেড়ে নেবে–বাংলা ভাষার মর্যাদার জন্য বায়ান্নর ভাষা–আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকেরা চেয়েছিল বাংলা ভাষাকে মর্যাদা না দিতে। কিন্তু তা নীরবে সহ্য না করে এ দেশের ছাত্র–জনতা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল।

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পাঠ করে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবগত হবে।

পাঠ–পরিচিতি

বায়ান্নর ভাষা–আন্দোলনে যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন তাঁদের প্রসঙ্গে কবিতাটি লেখা। পুলিশের গুলিতে নিহত সন্তানের জন্য মায়ের মনের তীব্র বেদনার কথা এখানে বিবৃত হয়েছে। শহরে প্রবাসী ছেলে মায়ের চিঠি পেয়েছে, গাঁয়ে মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য। সেই চিঠি পকেটে নিয়েই রাজপথে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে সে। অপরদিকে মা ছেলের জন্য কত খাবার তৈরি করে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কিন্তু তার ছেলে আর কোনোদিনও ফিরে আসবে না। কিন্তু মায়ের প্রতীক্ষার তো শেষ নেই।

কবি–পরিচিতি

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ পাস করে কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পরে সিভিল সার্ভিসে যোগদান করে বিভিন্ন উচ্চপদে সমাসীন হন। কাব্যের আঙ্গিক গঠনে এবং শব্দযোজনের বিশিষ্ট কৌশল তাঁর স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে। তিনি লোকজ ঐতিহ্যের ব্যবহার করে ছড়ার আঙ্গিকে কবিতা লিখেছেন। প্রকৃতির রূপ ও রঙের বিচিত্র ছবিগুলো তাঁর কবিতাকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছে। সমাজজীবনে নানা অসঙ্গতির বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হলো: *সাত নরীর হার, কখনো সুর, কমলের চোখ, আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি, আমার সময়, সহিষ্ণু প্রতীক্ষা, বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা* ইত্যাদি। ২০০১ সালের ১৯শে মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মাগো ওরা বলে কবিতাটির প্রেক্ষাপট কোনটি ?

ক. '৫২–এর ভাষা–আন্দোলন খ. '৬৬–এর ছয় দফা আন্দোলন

গ. '৬৯–এর গণঅভ্যুত্থান ঘ. '৭১–এর স্বাধীনতাযুদ্ধ

২. ছেলের চিঠি পেয়ে মা কি করে?

ক. কাঁদে আর হাসে খ. পড়ে আর হাসে

গ. পড়ে আর কাঁদে ঘ. কাঁদে আর মূর্ছা যায়

নিচের পঙ্‌ক্তিগুলো পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

মা আবার ধান ভানে,

বিন্নি ধানের খই ভাজে,
খোকা তার

কখন আসে কখন আসে।

৩. পঙ্‌ক্তিগুলো কোন কবিতা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে?

ক. স্বাধীনতা তুমি খ. শহিদ স্মরণে

গ. মাগো ওরা বলে ঘ. ফেরা

৪. উদ্ধৃতাংশে প্রকাশ পেয়েছে ছেলের জন্য মায়ের–

i. আয়োজন

ii. স্নেহ–ভালোবাসা

iii. প্রতীক্ষা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i, ii ও iii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সাল। তপুর মেসে তার স্ত্রী রেণু সকালে এসে বলল, মা তোমাকে এখনি বাড়ি যেতে বলেছেন। এমন গন্ডগোলের মাঝে মা তোমাকে কিছুতেই ঢাকায় থাকতে দিবেন না। তপু বলে, দেশের এ অবস্থায় কী করে আমি চুপচাপ বাড়ি গিয়ে বসে থাকব? তুমি বাড়ি যাও, মাকে বলো, আমি কয়েকদিন পরেই বাড়ি গিয়ে মাকে দেখে আসবো। রেণুকে বিদায় দিয়ে একটি প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে মিছিলে যোগ দেয় তপু। মুহূর্তের মধ্যেই একটি বুলেট এসে তপুর কপালে বিদ্ধ হয়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তপুর দেহ। সপ্তাহ খানেক পরে রেণু এসে মেস থেকে জামা কাপড় আর স্যুটকেস নিয়ে যায়। তপুর মা এগুলো বুকে আগলে রেখে সন্তানের পরশ অনুভব করে।

ক. 'মাগো ওরা বলে' কবিতায় খোকার মা কী শুকিয়ে রেখেছেন?
খ. খোকার পকেটের চিঠিটা ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা কেন?
গ. তপুর মায়ের মানসিকতার সাথে 'মাগো ওরা বলে' কবিতার খোকার মায়ের মানসিকতার সাদৃশ্যের দিকটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'দেশাত্মবোধের চেতনায় তপু ও খোকা যেন অভিন্ন'– বিশ্লেষণ কর।

২০১৬

একুশের গান

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ॥

জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কালবোশেখিরা
শিশু-হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি
দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, না, খুন-রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি ॥

সেদিনও এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে;

পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকনন্দা যেন,
এমন সময় ঝড় এলো এক, ঝড় এলো ক্ষ্যাপা বুনো ॥
সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র , শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি ॥

তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর-ছেলে বীর-নারী
আমার শহিদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালব ফেব্রুয়ারি
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি ॥

২০১৫

শব্দার্থ ও টীকা

রক্তে রাঙানো	— আলংকারিক অর্থে বহু মানুষের আত্মোৎসর্গে সিক্ত বা উজ্জ্বল।
অশ্রু-গড়া	— চোখের পানিতে নির্মিত। এটা কবির কল্পনা।
বসুন্ধরা	— পৃথিবী।
ক্রান্তি	— পরিবর্তন।
লগন	— লগ্ন, ঠিক সময়।
অলকনন্দা	— স্বর্গীয় নদীর ধারা।
ওরা গুলি ছোড়ে	— এখানে পাকিস্তানি সৈন্যদের বোঝানো হয়েছে। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলনকারীদের ওপর তারা গুলি ছুড়েছিল।

পাঠের উদ্দেশ্য

এই কবিতা পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভাষা-আন্দোলনে বাঙালির আত্মত্যাগ নিয়ে একদিকে গর্ব করতে শিখবে, অন্যদিকে তারা শহিদের রক্তের ঋণ শোধ করার জন্য সব ধরনের অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে।

পাঠ-পরিচিতি

১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সংকলনে 'একুশের গান' প্রথম ছাপা হয়। এখানে ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত ভাষা-আন্দোলনে বাঙালি ছাত্র-জনতার আত্মোৎসর্গের স্মৃতি স্মরণ করা হয়েছে। ভাষা-আন্দোলনের রক্তদান কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া যায় না। এখানে অন্যায়ভাবে গুলিবর্ষণকারী তৎকালীন পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির জাগ্রত প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে।

কবি-পরিচিতি

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী কথাশিল্পী, গীতিকার, প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট হিসেবে খ্যাতিমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। সমাজমনস্ক লেখক হিসেবে ভাষা-আন্দোলন (১৯৫২) ও মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১) চলাকালে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য শিশুতোষ গ্রন্থ হলো 'ডানপিটে শওকত', 'আঁধার কুঠির ছেলেটি' ইত্যাদি। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, ইউনেস্কো পুরস্কার, বঙ্গবন্ধু পুরস্কারসহ বিভিন্ন পদক ও পুরস্কারে ভূষিত হন।
তিনি ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন এবং বর্তমানে প্রবাস-জীবন অতিবাহিত করছেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে তোমার স্কুলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ কর এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকালে তোমার অনুভূতি বর্ণনার একটা প্রতিবেদন রচনা কর [শিক্ষার্থীর একক কাজ]।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'আমার শহিদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে'— এখানে কোন শহিদের কথা বলা হয়েছে?
   ক. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের খ. বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের
   গ. উনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থানের ঘ. নব্বুইয়ের গণআন্দোলনের

কবিতাংশটি পড়ে ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

'আমার বৃদ্ধ পিতার শরীরে
এখন পশুদের প্রহারের
চিহ্ন;'

২. কবিতাংশের ভাবের সাথে নিচের কোন লাইনটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়?
   ক. তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি
   খ. দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালব ফেব্রুয়ারি
   গ. দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি
   ঘ. দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি?

৩. উদ্দীপকে বর্ণিত পশুদের ন্যায় 'একুশের গান' কবিতায় পশু হচ্ছে—
   i. ওরা এদেশের নয়— চরণের 'ওরা'
   ii. দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি? —চরণের 'তোরা'
   iii. তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি— চরণের 'তুমি'

   নিচের কোনটি সঠিক
   ক. i ও ii খ. i ও iii
   গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. 'ঝড়ের রাত্রে, বৈশাখী দিনে, বরষার দুর্দিনে
অভিযাত্রিক, নির্ভীক তারা পথ লয় ঠিক চিনে।
হয়তো বা ভুল, তবু ভয় নাই, তরুণের তাজা প্রাণ
পথ হারালেও হার মানে নাকো, করে চলে সন্ধান
অন্য পথের, মুক্ত পথের, সন্ধানী আলো জ্বলে
বিনিদ্র আঁখি তারকার সম, পথে পথে তারা চলে।'

২. 'ওরা কেড়ে নিতে চায় বুকের স্বপ্ন, মায়ের মুখের ভাষা
ঝড়িয়ে রক্ত, ভাইয়ের প্রাণ, হৃদয়ের ভালোবাসা।
জেগে উঠো আজ সাহসী যৌবন, আনো নব উত্থান
দ্রোহের আগুনে পোড়াও ওদের, গাও বিজয় গান।'

   ক. 'একুশের গান' কবিতাটি কোন শহিদের স্মরণে লেখা হয়েছে?
   খ. 'সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা'—চরণটি ব্যাখ্যা কর।
   গ. উদ্দীপক–২–এর আলোকে 'একুশের গান' কবিতায় বর্ণিত 'ওরা এদেশের নয়'– চরণটি ব্যাখ্যা কর।
   ঘ. প্রথম উদ্দীপকের যিনি অভিযাত্রিক তিনিই 'একুশের গান' কবিতার ভাষা-শহিদ—বিশ্লেষণ কর।

২০১৬

কর্ম-অনুশীলন

মুখস্থনির্ভর মূল্যায়ন ব্যবস্থার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা এবং তাদের আগ্রহ, কৌতূহল ও ভালো লাগার জগতকে বিকশিত করার জন্য ধারাবিাহিক মূল্যায়ন অতীব জরুরি বিষয়। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ ও নতুন শিক্ষাক্রমে ধারাবাহিক মূল্যায়নের এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যপুস্তকগুলোতে **কর্ম-অনুশীলন** অংশে ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য কিছু নমুনা কর্মপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কর্মপত্রের মধ্যে এমনসব কাজের উল্লেখ আছে যার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ রয়েছে; বিনোদনের ভিতর দিয়ে তাদের দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ থাকছে এবং বাচনকলা থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও তাদের সৌন্দর্যবোধ, ন্যায়পরায়ণতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবিকতাবোধ, শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতা, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ ইত্যাদি বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নের যে দক্ষতাগুলোর সঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যে পরিচিত হয়েছেন সেই চিন্তন দক্ষতা, সমস্যা-সমাধান দক্ষতা, যোগাযোগ দক্ষতা (মৌখিক ও লিখিত), ব্যক্তিক দক্ষতা, সামাজিক দক্ষতা ও সহযোগিতামূলক দক্ষতা বিকাশের নিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করাই এই পর্বের উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এসব দক্ষতার বিকাশ ঘটলে তারা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে এবং পরিবর্তিত বিচিত্র পরিবেশ-পরিস্থিতি সাফল্যের সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারবে।

কর্ম-অনুশীলন অংশে দেওয়া কর্মপত্রগুলো নমুনা মাত্র। শিক্ষকগণ তাদের বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধাদির পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত কাজগুলো করাতে পারেন কিংবা নতুন কোনো কাজও দিতে পারেন। তবে নতুন কোনো কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় রাখতে হবে।

সমাপ্ত

২০১৯
শিক্ষাবর্ষ
দাখিল
৮ম-বাংলা

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরনিন্দা ভালো নয়

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য